সপ্তবর্ণা

সপ্তম শ্রেণী





জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সপ্তবর্ণা

সপ্তম শ্রেণী

সংকলন ও রচনা

ড. মাহবুবুল হক

সম্পাদনা

শওকত আলী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

চিত্রাঙ্কন
বিপ্লব সরকার
ফরিদা জামান
নাসির বিশ্বাস

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা, আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশাকরা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার–বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। তাই নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে এ ভাষায় ব্যবহারিক ও সৃজনশীল–উভয় দিকেই শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। অন্যদিকে, শিক্ষার্থীর ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাকে হতে হবে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। আমরা আশা করি, সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক 'সপ্তবর্ণা'য় বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করে উক্ত চেতনায় উজ্জীবিত হতে পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে কিছু বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সৃজনশীল প্রশ্ন কিছু কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫–৯৬ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তথা পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করা হয়নি।

বিষয়টি বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগকে সফল ও অর্থবহ করার জন্য এসএসসি পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের আলোকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিগত বছরগুলোর এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় মোট নম্বরের শতকরা ৮০ ভাগ প্রশ্ন স্মৃতিনির্ভর, যা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে উত্তর দেয়। অবশিষ্ট অধিকাংশ প্রশ্ন অনুধাবন স্তরের। প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা মূল্যায়নের প্রশ্ন খুবই কম। প্রচলিত এ পরীক্ষা পদ্ধতি মূলত শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করে আসছে।

বস্তুত মুখস্থ, সাজেশন এবং নোট নির্ভর এ পরীক্ষাপদ্ধতি শ্রেণীকক্ষের শিখন শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে বুঝে লেখাপড়ার পরিবর্তে মুখস্থ করার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। আর এ মুখস্থ করাও একটি কঠিন কাজ এবং এতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভাবিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এ সব কারণে শিক্ষার্থীদের মেধার যথাযথ বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও মেধার যথার্থ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের পাঠলব্ধ জ্ঞান ও অনুধাবনকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ এবং উপাত্ত ও ঘটনা বিচার–বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য যাচাই করার মতো ব্যবস্থা প্রশ্নপত্রে থাকা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সৃজনশীল প্রশ্নের অবতারণা।

প্রশ্নপত্রে পরিবর্তন

প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তিন ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্ন। পরীক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে প্রচলিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সংক্ষিপ্ত–উত্তর ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তন করা হচ্ছে।

দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ❒ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০% নম্বরের পরিবর্তে ৪০% বরাদ্দ থাকবে। তবে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতে ৩৫%, কম্পিউটার শিক্ষায় ৩০% এবং কৃষিশিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫% নম্বর বরাদ্দ থাকবে।
- ❒ বর্তমানে প্রচলিত শুধু সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঙ্গে বহুপদি সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- ❒ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরের জ্ঞান বা মনে রাখার জন্য ৪০%, অনুধাবন বা বুঝে লেখার জন্য ৩০%, অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবনকে প্রয়োগ করার জন্য ২০% এবং উচ্চতর দক্ষতার তথা বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণ বা মূল্যায়নের জন্য ১০% প্রশ্ন থাকবে।
- ❒ শিক্ষাক্রমের সকল বিষয়বস্তু মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করা হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তন

প্রচলিত ৫০% নম্বরের সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০% নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তন। ব্যতিক্রম হিসেবে ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে এমন বিষয়ে ৪০% সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন হবে মৌলিক অর্থাৎ যা পূর্বে কখনো ব্যবহৃত হয়নি।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন প্রক্রিয়া

❒ সৃজনশীল প্রশ্ন একটি দৃশ্যকল্প/উদ্দীপক, সূচনা বক্তব্য (*Stem* বা Scenario) দিয়ে শুরু হবে।

❒ দৃশ্যকল্প/উদ্দীপকটি কোনো ঘটনা, গল্প, চিত্র, মানচিত্র, গ্রাফ, সারণি, পেপার কাটিং, ছবি, উদ্ধৃতি, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি হতে পারে।

❒ দৃশ্যকল্প হবে মৌলিক (Unique)। পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি এ দৃশ্যকল্পটি থাকবে না। তবে বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃশ্যকল্প রচনায় পাঠ্যপুস্তক থেকে উদ্ধৃতাংশ ব্যবহার করা যাবে।

❒ দৃশ্যকল্পটি শিক্ষাক্রমের/পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে হতে হবে।

❒ দৃশ্যকল্পটি আকর্ষণীয় ও সহজে বোধগম্য হতে হবে।

❒ দৃশ্যকল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের অংশগুলো তৈরি হবে এবং প্রতিটি অংশ সহজ থেকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে হবে।

❒ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরের (ক–অংশ: জ্ঞান, খ–অংশ: অনুধাবন, গ–অংশ: প্রয়োগ ও ঘ–অংশ: উচ্চতর দক্ষতা) সমন্বয়ে গঠিত হবে।

❒ গণিত, উচ্চতর গণিত এবং হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের তিন স্তরের (সহজ, মধ্যম এবং কঠিন) সমন্বয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন গঠিত হবে।

❒ দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকবে না, তবে উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা থাকবে।

❒ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মোট নম্বর হবে ১০।

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশে নম্বর বন্টন

প্রশ্নের অংশ	চিন্তন দক্ষতার স্তর	নম্বর
ক.	**জ্ঞান দক্ষতা** কোনো ঘটনা, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি, প্রকারভেদ ইত্যাদি স্মরণ করা বা মুখস্থ করে লিখতে পারার দক্ষতাকে জ্ঞান স্তরের দক্ষতা বোঝায়।	১
খ.	**অনুধাবন দক্ষতা** কোনো অনুচ্ছেদ, কবিতা, প্রবন্ধ, লেখচিত্র ইত্যাদি পড়ে বুঝতে পারা, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ, কোনো কিছু একটা নিয়মে সাজানো, নিয়ম ও বিধি, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি ইত্যাদি পাঠ্যবই হতে হুবহু মুখস্থ না করে বুঝে নিজের ভাষায় উত্তর করার দক্ষতাকে অনুধাবন স্তরের দক্ষতা বলে।	২
গ.	**প্রয়োগ দক্ষতা** এটি হল কোনো অর্জিত জ্ঞান এবং অনুধাবন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দক্ষতা। সূত্র, নিয়ম–বিধি ইত্যাদি প্রয়োগ করে নতুন পরিস্থিতিতে কোনো প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারার দক্ষতাকে প্রয়োগ স্তরের দক্ষতা বলে।	৩
ঘ.	**উচ্চতর দক্ষতা** কোনো বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন করার দক্ষতা হল উচ্চতর দক্ষতা। আন্তঃসম্পর্ক, সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য নির্ণয়, তুলনা করা, পার্থক্য করা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তৈরি করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, কোনো সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা, মতামত প্রদান, প্রতিবেদন তৈরি করা ইত্যাদি উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের অন্তর্ভুক্ত।	–

সূচিপত্র

রূপসী বাংলাদেশ

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী



রূপসী বাংলাদেশ।

এখানে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক বিন্যাস ও বৈচিত্র্যে সৌন্দর্যের এক অপরূপ ছবি এঁকেছে। এমন রৌদ্রদীপ্ত উজ্জ্বল দিন আর জ্যোৎস্নালোকিত স্নিগ্ধ রাত্রি আর কোথায় পাব? এমন দিগন্তজোড়া শ্যামল শোভা আর ছায়াঘন বনরাজির তুলনা কোথায়? কোথায় মেলে এমন তরঙ্গভঙ্গে উদ্বেল পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, কপোতাক্ষ-কর্ণফুলি, সুরমা-গোমতী অথবা হাকালুকি হাওর, চলন বিল? কোথায় দৃষ্টি কাড়ে কাজলকালো বিল আর দিঘির জলে ফুটে থাকা অযুত শাপলার সৌন্দর্য, বাতাসে দোল খাওয়া সরষে ফুলের ফুলকিমালা?

প্রকৃতি এখানে অকৃপণ; তার নানা উপচারে ভরে দিয়েছে এদেশের মানুষের জীবন। গ্রামবাংলার প্রকৃতি নিটোল সৌন্দর্যের আধার। কিন্তু অঞ্চলভেদে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশেষ বিশেষ রূপটিও চোখে পড়ে। উত্তর বাংলার মাঠ-প্রান্তর-গ্রাম কী ঐশ্বর্যময়! কোথাও শালবনের বিপুল বিথার, কোথাও সুউচ্চ বাঁশঝাড় আর কোথাও বা মন-মাতানো মহুয়ার বন। বিল-ঝিলের কাকচক্ষু জলে শাপলা-কমল-কলমির ফুটন্ত মুখগুলো ভরে আছে স্নিগ্ধ লাবণ্যে। যেদিকে তাকাই, দেখি আলোকিত আকাশ, পাই সুরভিত বাতাস।

পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃতি মেজাজে কিছুটা রুক্ষ। অবারিত ধূসর প্রান্তর আর বালুময় পথঘাট যেন সেকথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। তবে সে রুক্ষতার মধ্যেও রয়েছে মাঠের পর মাঠ, আখের খেত, পানের বরজ আর আমের বাগিচা। গ্রামবাংলার চাষিদের স্নেহে ও যত্নে ওরা লালিত।

আর পূর্বাঞ্চল! টিলায় টিলায় সাজানো চায়ের বাগান সবুজের সুপরিকল্পিত সিঁড়ি যেন। এখানে-ওখানে ছায়া-দেওয়া গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে সান্ত্রির মতো। সেখানে গাছের সবুজে আর দেহের সবুজে এক হয়ে মিশে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়ে পাখি। ওদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে সেই জনবিরল পাহাড়ের দেশ। অবারিত সবুজের বুকে দাঁড়িয়ে দেখব, দূরের নীলাভ পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়েছে সূর্য। টিলার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী।



দিনের আলোয় সেখানে ঝলসে ওঠে রুপালি মাছ আর রাতে ফোটে অজস্র তারাফুল।

বাংলাদেশের মধুপুর ও ভাওয়াল অঞ্চলের মাটির রং গেরুয়া। সেই মাটিতে জেগে আছে সারি সারি গজারি গাছ। অবকাশের আনন্দ পেতে হলে এই ছায়া–সুনিবিড় বনফুলফোটা পথ ধরে চলে যাব। সেখানে পাখিরা আমাদের গান শোনাবে আর কচি কিশলয় পরম সোহাগে আমাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে। নির্জন বনভূমি নির্মল আনন্দে ভরে দেবে আমাদের মন।



আর দক্ষিণের উপকূল ! ফেনিল নদীমুখ ছুঁয়ে প্রসারিত সুন্দরবন। পল্লবঘন তরুবীথি চিরসবুজ পাতার টোপর পরে আছে। সেই বনে ঘর করে ডোরাদার হিংস্র বাঘ আর চিত্রল হরিণ।

দক্ষিণে সুনীল সাগরের বুক আলো করে জেগে আছে সুশোভন বাগবাগিচা – আমাদের দ্বীপাঞ্চল। সেখানে তাল–নারকেল–সুপুরির বাগান, বেত–শোলা–কেওড়ার বন আর অবারিত প্রান্তর জুড়ে ধানের খেত। সবুজ দ্বীপের শ্যামল প্রচ্ছায়ে ঘর বেঁধেছে এ–দেশের অগণিত মানুষ। কখনও সাগরের বিশাল জলরাশি উন্মত্ত গর্জনে ফুঁসে ওঠে, প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় ঘর–বাড়ি, জনপদ। কিন্তু সংগ্রামে দুর্জয় মানুষেরা আবারও ঘর বাঁধে, ফসলের স্বপ্ন দেখে। সাগরের বুকে প্রশান্তি নামে—সাগরে আর মানুষে আবার মিতালি। তখন রাতের সাগরে যত দূর দৃষ্টি চলে, নয়নলোভন দীপাবলি উৎসব। জেলেনৌকার লণ্ঠনের আলো ঢেউয়ের বুকে দুলছে কত রূপে, কত ছন্দে ! সারা আকাশ যেন উপুড় হয়ে দু চোখ ভরে দেখছে সে সৌন্দর্য।



পালাবদলের খেলায় বিচিত্র রূপের পসরা নিয়ে আসে ছয়টি ঋতু। গ্রীষ্মের আকাশে গনগনে সূর্য—রৌদ্রতপ্ত দিন। প্রচণ্ড উত্তাপে চিড় ধরে মাটিতে। ঊর্ধ্ব আকাশে কৃষকের প্রত্যাশার দৃষ্টি—কখন বৃষ্টি নামবে, মাটির তপ্ত বুক জুড়াবে। গাঁয়ের কিশোর–কিশোরীরা দল বেঁধে গান গেয়ে ফেরে, 'আল্লাহ্ মেঘ দে, পানি দে'।



এক সময় আকাশে শুরু হয় মেঘের আনাগোনা। নামে প্রথম বৃষ্টিবিন্দু। বাতাসে মাটির ঘ্রাণ। কখনও বায়ুকোণে বসে পুঞ্জ মেঘের মেলা। কালবৈশাখী ঝড় ওঠে। তাল-নারকেল-সুপুরির ঋজু দেহ দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হার মানে। গাছের ডাল ওড়ে, সেই সঙ্গে ঘরের চালও। নদী ও সাগরে জাগে প্রমত্ত ঢেউয়ের দোলা। সবলবাহু মাঝি হাল দিয়ে বুঝি মেঘের লাগাম ধরে রাখে। প্রকৃতির অজ্ঞানে নামে স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

বর্ষার ধারা মাঠ ঘাট প্রান্তর জুড়ে নতুন ফসলকে জানায় নিমন্ত্রণ। গায়ে গা ঘেঁষে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে থাকে ধান পাটের বাড়ন্ত শিশুরা। ডিঙি বেয়ে চলে চাষি। খেতের বুকে আচমকা জেগে ওঠে মসৃণ পথরেখা। কিন্তু চোখ না ফেরাতেই কোথায় মিলিয়ে যায় সে পথটি। বর্ষার গ্রামগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দ্বীপ যেন। অথই বিলে সাঁতরাতে দেখা যায় গাঁয়ের দামাল ছেলেদের—পানকৌড়িদেরও হার মানায় ওরা।



ঝকমকে আকাশ, ঝলমলে রোদ আর শিউলি-ফোটানো হাওয়া নিয়ে শরৎ আসে। সারা বেলা আকাশে সাদা মেঘের ছুটোছুটি—এতটুকু বিরাম নেই। রাতের আকাশে কোটি তারার খই।

হেমন্তের বাংলাদেশ হেমবরণি। কমলা রোদে উজ্জ্বল সোনালি ধানের গুচ্ছ। ঢেঁকির তালে আর ধান ভানার গানে নবান্নের উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে গ্রামবাংলা।

কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে শীত আসে। শাল-সেগুন, আমলকী-জামরুল, কৃষ্ণচূড়া-শিরীষের বনে লাগে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া। বাতাসে বাতাসে রিক্ততার সুর। বসন্তকে নতুন করে সাজাবে বলেই বুঝি প্রকৃতির রাজ্যে চলে গোপন প্রস্তুতি। তখন চাঁদের বুড়িকে দেখব বলে তাকাই কুয়াশা-মোড়া পূর্ণিমার চাঁদের দিকে। শীতের পত্রহীন ডালপালা কেমন হিজিবিজি রেখা এঁকে দিয়েছে ওর মুখে।



বসন্তে বনে বনে নতুন পাতা আর পুষ্পমঞ্জুরির সমারোহ। পাতায় পাতায় আলোর নাচন। মন্দারে, কৃষ্ণচূড়ায় চলে ফুল ফোটাবার পালা। শেষ বিকেলের গোলাপি আলো মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই দূর আকাশে চোখ মেলে সন্ধ্যাতারা। রাত নামে। আকাশে তখন

লক্ষ তারার মেলা। তাই দেখে জোনাকিরাও বুঝি তারা হতে চায়। আশ্চর্য সুন্দর বসন্ত রাতের দৃশ্য শুধু চোখই জুড়ায় না, মনও কাড়ে।

দু চোখ ভরে দেখবার মতো এত সৌন্দর্য, দু হাত ভরে নেবার মতো এত ঐশ্বর্য, এই তো আমাদের বাংলাদেশ। প্রকৃতিই এদেশের মানুষকে করেছে ভাবুক, কবি, শিল্পী, সাধক ও কর্মী। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন এবং তার ভাবনার জগৎ এদেশের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

শব্দার্থ ও টীকা

রূপসী— রূপ-লাবণ্যে ভরা, রূপবতী, সুন্দরী।

বিন্যাস— সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো।

বৈচিত্র্য— নানা রূপের শোভা, নানা রূপের একত্র সমাবেশ, বিচিত্রতা।

অপরূপ— অপূর্ব, অতুলনীয়, যে রূপের তুলনা নেই।

রৌদ্রদীপ্ত— রোদের আলোয় উজ্জ্বল, সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত।

জ্যোৎস্নালোকিত— চাঁদের আলোয় আলোকিত।

স্নিগ্ধ— কোমল, মধুর, আরামদায়ক, শীতল।

দিগন্তজোড়া— যা দিগন্ত জুড়ে আছে, যত দূর দেখা যায় তত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

তরঙ্গভঙ্গে উদ্বেল— ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিরন্তর উচ্ছলিত।

হাকালুকি হাওর— বৃহত্তর সিলেট জেলার এক বিশাল জলাশয়।

চলন বিল— নাটোর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে রাজশাহী-পাবনার সীমান্ত এলাকা জুড়ে এর অবস্থান। দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৮ কিলোমিটার। এই বিলের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে আত্রাই নদী।

ফুলকিমালা— আগুনের কণাগুচ্ছ, দূর থেকে সরষে ফুলের গুচ্ছ দেখতে আগুনের অজস্র ফুলকির মতো মনে হয়।

উপচার— উপকরণ, সামগ্রী, উপাদান।

বিথার— বিস্তার, পরিব্যাপ্তি, ছড়ানো অবস্থা।

কাকচক্ষু— কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ।

সুরভিত— সুবাসিত, সুগন্ধযুক্ত।

বরজ— পানখেত।

সবুজের সুপরিকল্পিত সিঁড়ি যেন— চা-বাগানে পাহাড় বা টিলায় ধাপে ধাপে সারিবদ্ধভাবে চা-গাছ লাগানো হয়ে থাকে। দূর থেকে সেগুলো দেখে মনে হয় যেন সবুজ রঙের সুন্দর সিঁড়ি।

জনবিরল— যেখানে লোকজন খুব কম।

মাটির রং গেরুয়া— গৈরিকবর্ণের মাটি, হলদে ও লালচে রঙের পাহাড়ি মাটি।

কিশলয়— নতুন বা কচি পাতা।

ফেনিল— ফেনাযুক্ত।

নদীমুখ— মোহনা, সাগর ও নদীর মিলিত হওয়ার জায়গা।

ফেনিল নদীমুখ— নদী যেখানে সাগরে মেশে, সেখানে নদী ও সাগরের ঢেউয়ের মুখোমুখি ধাক্কায় প্রচুর ফেনার সৃষ্টি হয়। ফলে মোহনার জলরাশি ফেনিল হয়ে ওঠে।

পল্লবঘন— পাতায় ভরা।

তরুবীথি— গাছ–গাছালির সারি।

টোপর— মুকুট।

ডোরাদার হিংস্র বাঘ— রয়েল বেঙ্গাল টাইগার নামে পরিচিত, গায়ে ডোরাকাটা দাগ।

প্রচ্ছায়— নিবিড় ছায়া, ছায়াময় জায়গা।

দুর্জয়— অজেয়, অদম্য।

সাগর আর মানুষে আবার মিতালি— উপকূলের মানুষের জীবন ও জীবিকা বহুলাংশে সাগরের ওপর নির্ভরশীল। জলোচ্ছ্বাসে তাদের স্বাভাবিক জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু দুর্যোগশেষে আবার তারা সাগরের বুকে পাড়ি দেয় জীবিকার সন্ধানে। শান্ত সাগরের সঙ্গো তখন আবার মানুষের মিতালি গড়ে ওঠে।

উদ্বেল— অস্থির, সীমা ছাপিয়ে ওঠা, বেলাভূমি অতিক্রমকারী।

বায়ুকোণে— উত্তর–পশ্চিম কোণে, ওই দিক থেকেই কালবৈশাখীর ঝড় আসে।

পানকৌড়ি— জলচর পাখি।

নবান্ন— হেমন্তে নতুন ধান কাটার পর অনুষ্ঠিত উৎসব।

পসরা— পণ্যসামগ্রী। এখানে নানা সৌন্দর্যের সম্ভার বোঝাচ্ছে।

চিড়— ফাটল।

ঋজু— সোজা, যা বাঁকা নয়, খাড়া।

প্রমত্ত— অশান্ত, প্রবল, প্রচণ্ড।

পুষ্পমঞ্জুরি— ফুলের কলি।

মন্দার— মাদার গাছ, স্বর্গের পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ।

একাত্ম— অভিন্নহৃদয়, একপ্রাণ।

পাঠ–পরিচিতি

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ষড়ঋতুর অপরূপ রূপবৈচিত্র্যের ছবি তুলে ধরা হয়েছে 'রূপসী বাংলাদেশ' রচনায়। বাংলাদেশের প্রকৃতি যেন বৈচিত্র্যময় মনোলোভা সৌন্দর্যের খনি। এর রৌদ্রময় উজ্জ্বল দিন, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময় রাত, দিগন্ত–জোড়া ছায়াঘন বন–বনানী, কত না নদীর রুপালি ঢেউয়ের হাসি ইত্যাদির তুলনা নেই। এদেশের কাজলকালো দিঘির জলে ফুটে থাকা অযুত শাপলার শোভা, মাঠে মাঠে হাওয়ার দোলা, সরষে ফুলের অফুরন্ত সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে।

প্রকৃতির অঢেল সৌন্দর্যের রূপ ছড়িয়ে আছে গোটা দেশ জুড়ে। তবে অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্যও আছে। শাল মহুয়ার ঘন বীথি, ঝিলিমিলি ঝিল আর বিশাল বিল প্রকৃতিকে করেছে ঐশ্বর্যশালী ও লাবণ্যময়।

পশ্চিম অঞ্চলের অবারিত প্রান্তর, বালুময় পথঘাটে আছে ধূলিধূসর রুক্ষতা। তবে মাঠের পর মাঠ, আখের খেত, আমবাগান ও পানের বরজ আছে। সেখানেও দিগন্ত জুড়ে সবুজ শ্যামলিমা।

পূর্বাঞ্চলে নীলাভ পাহাড়ের ঢালে বিছানো চায়ের বাগানগুলো যেন সবুজ সিঁড়ির ধাপ দিয়ে সাজানো। তারই ফাঁকে ফাঁকে ছায়াবীথির বিস্তার। পাশ দিয়ে বয়ে–যাওয়া পাহাড়ি নদীর বুকে ঢলে–পড়া সূর্যের আভা অপূর্ব রঙের কারুকাজ ফুটিয়ে তোলে।

মধুপুর ও ভাওয়াল অঞ্চলের প্রকৃতিতে রয়েছে ভিন্নতর দৃশ্যপট। সেখানে গেরুয়া মাটিতে সারি সারি গজারি গাছের বিস্তার। আর দক্ষিণের উপকূল জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। সেখানে রয়েছে চিরসবুজ পাতার টোপর পরা পল্লবঘন তরুবীথি। আর সেখানেই বসতি পেতেছে ডোরাকাটা বাঘ আর চিত্রল হরিণেরা।

দক্ষিণের সুনীল সাগরের বুকে ভেসে–থাকা দ্বীপাঞ্চলে রয়েছে আর এক ধরনের চিত্র। সেখানে প্রকৃতির দৃশ্যপট তৈরি করেছে তাল-নারকেল-সুপুরির বাগান ; বেত-শোলা-কেওড়ার বন আর প্রান্তরজোড়া ধানখেত। সেখানে ঘর বেঁধেছে সংগ্রামে দুর্জয় মানুষেরা। জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে তারা বাঁচে আর সমুদ্র শান্ত থাকলে তারা বাঁচে সাগরের সঙ্গে মিতালি করে।

প্রকৃতির রূপ বদলের আর এক ধরনের বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে এদেশের ষড়ঋতুর লীলায়। রঙে ও রূপে, ফুলে ও ফসলে এক–একটি ঋতুর বৈশিষ্ট্য অনন্য।

রৌদ্রতপ্ত দিন নিয়ে আসে গ্রীষ্ম। প্রচণ্ড তাপে শুকিয়ে যাওয়া মাটিতে ধরে ফাটল। বৃষ্টির প্রত্যাশায় উন্মুখ হয় সবাই। হঠাৎ কখনো বায়ুকোণ থেকে ধেয়ে আসে কালবৈশাখীর ঝড়। শুরু হয় ধ্বংস তাণ্ডব। কিন্তু সেই সঙ্গে বৃষ্টি এনে দেয় আবার স্নিগ্ধ প্রশান্তি। বর্ষার ধারা মাঠঘাট প্রান্তরকে ডুবিয়ে দেয় পানিতে। বর্ষায় গ্রামগুলো পাশাপাশি ভেসে থাকা অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপের রূপ নেয়। শরৎ আসে ঝলমলে রোদ আর শিউলি–ফোটানো হাওয়া নিয়ে। রাতের আকাশে বসে কোটি তারার মেলা। হেমন্তে বাংলাদেশ নেয় সোনার বরন চেহারা। কমলা রোদ মাঠে মাঠে হাসি ছড়ায়। সোনালি ধানের গুচ্ছে লাগে হিমেল হাওয়ার কাঁপুনি। কুয়াশার চাদর গায়ে শীত আসে। গাছের পাতারা ঝরে পড়ে। নতুন করে সাজার জন্য প্রকৃতি নেয় রিক্ততার রূপ। নতুন পত্রপল্লব আর পুষ্পমঞ্জুরির সমারোহ নিয়ে আসে বসন্ত। রাতের আকাশে দেখা দেয় লক্ষ তারার মেলা।

এমনি বিচিত্র ও অপরূপ সৌন্দর্যের আধার আমাদের এই বাংলাদেশ। আর এজন্যই এদেশে এত সাধক, কবি, শিল্পী ও কর্মীর এমন অপূর্ব সমাবেশ।

লেখক–পরিচিতি

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখলেও শিক্ষাবিষয়ক তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'সুশিক্ষক', 'বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি', 'শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কথা' ইত্যাদি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

তিনি ১৯২৩ সালে মৌলভিবাজার জেলার কুলাউড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং দীর্ঘ দিন শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২০০৬ সালের ১১ই জুন ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন অঞ্চলের প্রকৃতি মেজাজে কিছুটা রুক্ষ?

ক. পূর্বাঞ্চল   খ. পশ্চিমাঞ্চল
গ. দক্ষিণাঞ্চল   ঘ, উত্তরাঞ্চল

২. 'কাকচক্ষু' উপমাটির সাথে কোন শব্দের মিল করা যায়?

ক. ফুল   খ. জল
গ. নদী   ঘ. তরু

৩. চাঁদের বুড়িকে কুয়াশা–মোড়া অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় কোন ঋতুতে?

ক. বর্ষা   খ. শরৎ
গ. হেমন্ত   ঘ. শীত

৪. 'সাগর আর মানুষে আবার মিতালি' বাক্যটিতে বোঝানো হয়েছে—
   i. সাগর তীরে মানুষ ঘর বাঁধে
   ii. জলোচ্ছ্বাসের পরবর্তী অবস্থা
   iii. সাগরকে নির্ভর করে জীবন ও জীবিকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. i ও iii	ঘ. ii ও iii

৫. তাল–নারকেল–সুপুরির ঋজুদেহ দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হার মানে! কোন উদাহরণটি একই ঋতুর সমার্থক বর্ণনা?

ক. রাতের আকাশে কোটি তারার খই	খ. পাতায় পাতায় আলোর নাচন
গ. মাঝি হাল দিয়ে বুঝি মেঘের লাগাম ধরে	ঘ. তরুবীথি চিরসবুজ পাতার টোপর পরে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্ধৃতাংশটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

ধনধান্য পুষ্পেভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

ক. উদ্ধৃতাংশে কোন দেশকে সকল দেশের রানী বলা হয়েছে?
খ. লেখক স্বপ্নময় এবং ঐশ্বর্যময় যে প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন রূপসী বাংলাদেশ প্রবন্ধের আলোকে তার বর্ণনা দাও।
গ. উদ্ধৃত কবিতাংশটুকু তোমার পাঠ্যবই–এর প্রবন্ধের সঙ্গে কোন দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত তা বর্ণনা কর।
ঘ. হেমন্তের সোনালি ধান আর বসন্তের পুষ্পমঞ্জুরির দৃশ্য কীভাবে লেখকের মন ভরিয়ে দিয়েছে তোমার পঠিত প্রবন্ধের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের উদ্ধৃতাংশটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

দু চোখ ভরে দেখবার মতো এত সৌন্দর্য, দু হাত ভরে নেবার মতো এত ঐশ্বর্য, এই তো আমাদের বাংলাদেশ। প্রকৃতিই এদেশের মানুষকে করেছে ভাবুক, কবি, শিল্পী, সাধক ও কর্মী। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন এবং তার ভাবনার জগৎ এই দেশের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

ক. ভাবুক, কবি, শিল্পী এরা তাদের চেতনার উৎস কোথা থেকে খুঁজে পায়?
খ. 'এই তো আমাদের বাংলাদেশ'—লেখক কোন বাংলাদেশের কথা বুঝিয়েছেন, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
গ. উদ্ধৃতাংশে যে ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে তা কীভাবে ব্যবহার করা যায়—যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
ঘ. মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কোন ধরনের আচরণসমূহ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে বিশ্লেষণ কর।

মরু–ভাস্কর

হবীবুল্লাহ্ বাহার



যেসব মহাপুরুষের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হয়েছে—মানুষের জীবনে যাঁরা এনেছেন সৌষ্ঠব, ফুটিয়েছেন লাবণ্য, মরু–ভাস্কর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবন আলোচনা করতে গিয়ে সকলের আগে আমাদের চোখে পড়ে তাঁর ঐতিহাসিকতা। হযরতের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিবরণ যেভাবে রক্ষা করা হয়েছে, সত্যের কষ্টিপাথরে ঘষে যেভাবে যাচাই করা হয়েছে, পৃথিবীর কোনো মহাপুরুষের বেলায় তা করা হয়নি।

আরবের লোকের স্মৃতিশক্তি ছিল সত্যি অসাধারণ। বিরাট বিরাট কাব্যগ্রন্থ সহজেই তারা মুখস্থ করে ফেলত। আরবি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মুখস্থ না করে কোনো কিছু লিখে রাখা আরবিরা লজ্জার কথা বলে মনে করত। সাহাবিরা এবং অন্যান্য হাদিসজ্ঞরা অনেকেই হাজার হাজার হাদিস মুখস্থ করে রাখতেন।

হযরত মোস্তফা (স) মানবতার গৌরব। আল্লাহ্র নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন এবং সেভাবেই তিনি জীবনযাপন করেছেন। ৬৩ বছরের ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে হযরতকে কত পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখলে অবাক হতে হয়। যিনি ছিলেন এতিম, তিনি হয়েছিলেন সারা আরবভূমির অবিসংবাদিত নেতা।

হযরত যখন মদিনার অধিনায়ক, তখন তাঁর ঘরের আসবাব ছিল—একখানা খেজুর পাতার বিছানা আর একটি পানির সুরাহি। অনেক দিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হত এবং অনেক সময় উনুনে জ্বলত না আগুন।

হযরতের চরিত্রে সংমিশ্রণ হয়েছিল কোমল আর কঠোরের। বিশ্বাসে যিনি ছিলেন অজেয়, অকুতোভয়, সত্যে ও সংগ্রামে যিনি বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল, তাঁকেই আবার দেখতে পাই—কুসুমের চেয়েও কোমল। বন্ধু-বান্ধবের জন্য তাঁর প্রীতির অন্ত নেই—মুখ তাঁর সব সময় হাসিহাসি, ছেলেপিলের সঙ্গে মেশেন তিনি একেবারে শিশুর মন নিয়ে—পথে দেখা হলে বালক–বন্ধুকে তার বুলবুলির খবর জিজ্ঞেস করতে তাঁর ভুল হয় না। বন্ধুবিয়োগে চক্ষু তাঁর অশ্রুসিক্ত হয়। বহু দিন পর দাই–মা হালিমাকে দেখে 'মা আমার, মা আমার' বলে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন। মক্কাবিজয়ের পর সাফা পর্বতের পাদদেশে বসে হযরত বক্তৃতা করছিলেন। একজন লোক তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হযরত অভয় দিয়ে বললেন : ভয় করছ কেন ? আমি রাজা নই, কারও মুনিবও নই—এমন মায়ের সন্তান আমি, শুষ্ক খাদ্যই যাঁর আহার্য।

হযরত জীবনে কাউকে কড়া কথা বলেননি–কাউকে অভিসম্পাত দেননি। আনাস নামক এক ভৃত্য দশ বছর হযরতের চাকরি করার পর বলেছেন—এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হযরতের মুখে তিনি কড়া কথা শোনেননি কখনও। মক্কায় বা তায়েফে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও হযরতের মুখে অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারিত হয়নি। বরং তিনি বলেছেন, এদের জ্ঞান দাও প্রভু—এদের ক্ষমা করো।

জগতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা মোস্তফা চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও দাস–ব্যবসায়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মানবাত্মা যখন গুমরে মরছিল, রসুলুল্লাহ্ (স.) তখন প্রচার করেন সাম্যের বাণী।

সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। চরম দুরবস্থার হাত থেকে দাসদের পরিত্রাণের জন্যও তিনি কাজ করেছেন। মানুষকে সালাতে আহ্বান করার জন্যে মুয়াযযিন নিযুক্ত করেছেন হাবশি গোলাম হযরত বেলালকে।

নারীর অবস্থার পরিবর্তন এনেছেন হযরত। নারীর মর্যাদা ছিল তাঁর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা)–কে কেন্দ্র করে সে যুগে গড়ে উঠেছে নারীত্বের আদর্শ। হযরত ঘোষণা করেছেন : বেহেশত মায়ের পায়ের নিচে।

কুসংস্কারকে হযরত কোনো দিনই প্রশ্রয় দেননি। এক বার হযরতের পুত্রের মৃত্যুদিনে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। লোকে বলাবলি করতে থাকে—বুঝি হযরতের বিপদে প্রকৃতি শোকাবেশ পরিধান করেছে। তখনি সভা ডেকে হযরত এই বাস্তবতাবিরোধী কথার প্রতিবাদ করলেন; বললেন, "আল্লাহ্‌র বহু নিদর্শনের মধ্যে দুটি—চন্দ্র ও সূর্য। কারুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র–সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না।"

হযরত জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন সব সময়। জ্ঞান যেন হারানো উটের মতো—তাকে তিনি খুঁজে বের করতে বলেছেন যেখান থেকেই হোক। আরও বলেছেন তিনি : জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদের লহুর চাইতেও পবিত্র।

এইভাবে জ্ঞানের আলোয় মানুষের হৃদয় উজ্জ্বল করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন তিনি।

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

শব্দার্থ ও টীকা

মরু–ভাস্কর— মরুভূমির সূর্য। এখানে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বোঝানো হয়েছে।

সৌষ্ঠব— সুগঠন।

কষ্টিপাথর— ঘষে সোনা পরীক্ষা করার এক রকম কালো পাথর।

সুরাহি— পানির এক রকম পাত্র, সোরাই, জলের কুঁজো।

স্নেহ— আদর, তেল জাতীয় পদার্থ।

অকুতোভয়— যার কোনো কিছুতে ভয় নেই, নির্ভীক, অসম সাহসিক।

অভিসম্পাত— অভিশাপ।

পরিত্রাণ— মুক্তি।

হাবশি গোলাম— আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) জন্মগ্রহণকারী ক্রীতদাস।

লহু— রক্ত।

পাঠ–পরিচিতি

'মরু–ভাস্কর' প্রবন্ধে লেখক মহানবীর জীবন ও জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন যা আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার বিকাশে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সেই মহাপুরুষদের মধ্যে এক জন যিনি চরিত্রবান; মানবপ্রেমে, জীবপ্রেমে মহীয়ান। বিপদে ধৈর্যশীলতা, দারিদ্র্যে অচঞ্চলতা, শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীলতার মহৎ দৃষ্টান্তে তাঁর জীবন সমুজ্জ্বল। অনেক মহাপুরুষের জীবন প্রকৃত তথ্যের চেয়ে কাল্পনিক নানা তথ্যে ভরা। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের যাবতীয় তথ্য সবই ঐতিহাসিক সত্য।

আল্লাহ্‌র মহান নবী হওয়া সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন মানুষ। তাই তিনি মানবজাতির গৌরব।

তাঁর ৬৩ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে, নানা পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর জীবনের মূলধারা ছিল অপরিবর্তিত। তিনি সব সময় সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। তাঁর চরিত্রে মিশে ছিল হাসিখুশি ভাব, কোমলতা ও কঠোরতা। আপন বিশ্বাসে, সত্যের জন্য সংগ্রামে তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল। কিন্তু নারী-পুরুষ, বন্ধু-বান্ধব, শিশু-কিশোর, আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণে তিনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। তাঁর চরিত্র ছিল প্রীতিতে, মমতায়, স্নেহে, সৌজন্যে দয়ার আধার। জীবনে কাউকে তিনি কড়া কথা বলেননি, কাউকে অভিসম্পাত দেননি। নিজে নির্যাতিত হয়েও প্রতিদানে তিনি ক্ষমা করেছেন।

হযরত মানুষে মানুষে ভেদাভেদের পরিবর্তে সাম্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি চরম দুরবস্থা–কবলিত ক্রীতদাসের পরিত্রাণের জন্য কাজ করে গেছেন। নারীর অবস্থার পরিবর্তন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অন্য ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু।

হযরত কুসংস্কারকে কখনও প্রশ্রয় দেননি। যা সত্য, যা যুক্তিগ্রাহ্য, তার পক্ষেই তিনি অবস্থান নিয়েছেন। হযরত জ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। এমনকি শহীদ হওয়ার চেয়ে জ্ঞানসাধনাকে তিনি দিয়েছেন অধিকতর গুরুত্ব। এর ফলে মুসলিম সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছে।

লেখক–পরিচিতি

হবীবুল্লাহ্ বাহার ছিলেন কবি নজরুলের 'ভক্ত শিষ্য' এবং চিন্তা ও কর্মে পুরোপুরি মানবতাবাদী।

১৯০৬ সালে তিনি ফেনী জেলার গুতুমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

মূলত প্রবন্ধকার হলেও তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। 'শেফাউল মূলক' ছদ্মনামে এক সময় তিনি দৈনিক পত্রিকায় সরস অথচ তীক্ষ্ণ রম্যরচনা লিখেছেন। এ ছাড়া তিনি কিছু ছোটগল্পও লিখেছেন।

'বুলবুল' নামে একটি পত্রিকা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন তিনি এবং তিনি ছিলেন ঐ পত্রিকারই অন্যতম সম্পাদক।

১৯৬৬ সালের ১৫ই এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন ক্ষেত্রে বজ্রের মতো কঠোর ছিলেন?

ক. গভীর আত্মবিশ্বাসে খ. নারীর মর্যাদারক্ষায়

গ. সত্য ও সংগ্রামের চেতনায় ঘ. সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায়

২. এদের জ্ঞান দাও প্রভু—এদের ক্ষমা করো—উক্তিটির মধ্য দিয়ে হযরত (স.)-চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রাধান্য পেয়েছে?

ক. ক্ষমা ও মহানুভবতা খ. দয়া ও করুণা

গ. প্রেম ও ভালোবাসা ঘ. বাৎসল্য ও ন্যায়বিচার।

৩. 'কারুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না'—উক্তিটির মধ্য দিয়ে হযরতের কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সাম্যবাদিতার খ. মানবপ্রেমের

গ. সংস্কারমুক্তির ঘ. দৃঢ়বিশ্বাসের

৪. কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আরবের লোকেরা—ছিল অসাধারণ?

ক. সহিংসতার খ. ধৈর্যের

গ. পেশিশক্তির ঘ. স্মৃতিশক্তির

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :**

হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কোনো ভাস্কর তাঁর ছিল না। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। সকলের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল হাসিমাখা। ছোট ছোট শিশুদের তিনি খুব বেশি স্নেহ করতেন। তাঁর বালক-বন্ধুর সাথে দেখা হলে তিনি বন্ধুর বুলবুলির খবর নিতে ভুলে যেতেন না।

ক. হযরত মুহাম্মদ (স) কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন?

খ. মানুষের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আচরণ কীরূপ ছিল উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

গ. সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়নে রসুল (স)-এর আদর্শ কতটুকু ফলদায়ক যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. বালক-বন্ধুর কাছে তিনি বুলবুলির খবর জানতে চাইলেন, এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

হযরত জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছিলেন সব সময়। জ্ঞান যেন হারানো উটের মতো—তাকে তিনি খুঁজে বের করতে বলেছেন যেখান থেকেই হোক। আরও বলেছেন তিনি : জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদের লহুর চাইতেও পবিত্র।

ক. 'লহু' শব্দের অর্থ কী?

খ. হযরত মুহাম্মদ (স) কীভাবে জ্ঞানচর্চা করতে বলেছেন?

গ. জ্ঞান অন্বেষণের জন্য আমাদের কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার তার একটি বিবরণ দাও।

ঘ. 'জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদের লহুর চাইতেও পবিত্র'-একথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

জাতীয় চার নেতা



১৯৭১ সাল। বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী শুরু করেছে বর্বর অভিযান। নারী–পুরুষ–শিশু–বৃদ্ধের লাশ পড়ে আছে যেখানে–সেখানে। ঘরবাড়ি জ্বলছে আগুনে। লুট হয়ে যাচ্ছে দোকানপাট। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে শহরের মানুষ ছুটছে গ্রামে, গ্রামের মানুষ ছিটকে পড়ছে চারদিকে, সীমান্ত পার হয়ে অনেকে চলে যাচ্ছে ভারতে।

২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধুকে। বন্দি হওয়ার আগ মুহূর্তে তিনি ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়ে যান।

পাকিস্তানি বাহিনীর হামলার মুখে দেশত্যাগ করেন তাঁর সহকর্মীরা। ১০ই এপ্রিল তাঁরা বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করেন।

১৭ই এপ্রিল দেশি–বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় শপথ নিল নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার। বৈদ্যনাথতলার নতুন নাম হল মুজিবনগর, বঙ্গবন্ধু হলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিলেন উপ–রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী হলেন তাজউদ্দীন আহমদ। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান প্রমুখ। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে বললেন, 'আজ এই আম্রকাননে একটি নতুন জাতি জন্ম নিল। আমরা লড়াইয়ে নেমেছি। এ লড়াইয়ে আমাদের জয় অনিবার্য।' বিশ্ববাসী জানল, দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধরত মানুষেরা জানল, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর যোগ্য সহকর্মীরা শক্ত হাতে ধরেছেন হাল।

চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে যুদ্ধরত বাংলাদেশ সরকারকে। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য চার সহকারী এ সরকারের দায়িত্ব পালনে অটল থাকেন। তাঁদের মধ্যে ছিল ত্যাগের মনোভাব, ছিল বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামে প্রবল আস্থা। এই চারজনের জীবনে আমরা দেখি একই আদর্শের প্রতিফলন। মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তাঁরা সেই চেতনার ঐক্য প্রকাশ করেন রক্তলেখায়। আর তাই চার জাতীয় নেতা হিসেবে দেশবাসীর অন্তরে তাঁরা স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

চার নেতা এসেছিলেন দেশের চার প্রান্ত থেকে, যেন চারজনে মিলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সমগ্র বাংলাদেশের। সৈয়দ নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলার যশোদল গ্রামে। কর্মস্থল ছিল ময়মনসিংহ। তাজউদ্দীন আহমদ জন্মেছিলেন গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ার দরদরিয়া গ্রামে। কর্মস্থল ছিল ঢাকা। ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী জন্মেছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর থানার কুড়িপাড়া গ্রামে। কর্মস্থল ছিল পাবনা। আর এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামানের জন্ম রাজশাহীর এক ভূস্বামী পরিবারে। কর্মস্থলও ছিল রাজশাহী। একজন এসেছেন বিস্তীর্ণ হাওড় এলাকার উদার পরিবেশ থেকে। আরেকজন লালিত হয়েছেন ভাওয়াল গড়ের বনরাজির শ্যামল ছায়ায়। দুই প্রধান নদী পদ্মা ও যমুনার তীরে কেটেছে অপর দু'জনের শৈশব। এমনিভাবে চার নেতা যেন বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিরও প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

বয়সেও তাঁরা ছিলেন প্রায় কাছাকাছি। এম. মনসুর আলী এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, জন্মেছেন ১৯১৯ সালে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ উভয়ের জন্ম ১৯২৫ সালে এবং এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামানের জন্ম ১৯২৬ সালে। লেখাপড়ায় সবাই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স পেয়ে স্নাতক হন। তাজউদ্দীন আহমদ আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে চুতর্থ স্থান লাভ করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করেন। তিনি যখন রাজশাহী কলেজে পড়তেন তখন সেখানে অধ্যাপক ছিলেন সাইদুর রহমান। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন 'স্বাধীনতা লাভের পর, তখন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী, আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলত, স্যার, আপনি কিন্তু আমাকে লজিকে সত্তরের ওপর নম্বর দিয়েছিলেন। আমি সেকথা ভুলিনি। মনসুর আলী এমনভাবে কথাটা বলত, আমি যেন ইচ্ছে করেই ওর পরীক্ষার খাতায় নম্বরটা বসিয়ে দিয়েছিলাম। আসলে তা নয়, যুক্তিবিদ্যায় ও বেশ ভালো ছাত্র ছিল এবং নম্বরটা ওর প্রাপ্য ছিল।'

চার নেতার সবচেয়ে বড় মিল ছিল দেশের প্রতি ভালোবাসার দিক দিয়ে। বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একেবারে শুরু থেকে সক্রিয় ছিলেন চারজনই। ভাষা আন্দোলনে সকলের ছিল বিশেষ ভূমিকা। ১৯৪৮ সালে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ১৯৫২ সালে পাবনায় ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ায় গ্রেফতার করা হয় এম. মনসুর আলীকে। তাজউদ্দীন আহমদ ঢাকায় এবং এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান রাজশাহীতে এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার কিছুকালের মধ্যে চারজনই স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরে তাঁরা হন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা।

পাকিস্তানি শাসকদের পীড়ন–নির্যাতনের পরিবেশে রাজনীতি করা সহজ ছিল না। কিন্তু সেই কঠিন সাধনার পথ তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। বারবার কারাগারে যেতে হয়েছে তাঁদের। আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনায় সুবিধা হবে বলে চার নেতাই আইনের পেশা গ্রহণ করেছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা শেষ করে ভালো চাকরি বা পেশা বেছে নেওয়ার সুযোগ তাঁদের ছিল। কিন্তু তাঁদের মনে ছিল দেশের দুর্গতি মোচনের প্রবল তাগিদ। তাই ব্যক্তিগত আরাম–আয়েশের কথা না ভেবে তাঁরা ঝাঁপ দিয়েছিলেন মানুষকে সংগঠিত করার কাজে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তো কেন্দ্রীয় সরকারের লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দেন দেশের কাজ করবেন বলে। এমনি সংগ্রামী চেতনা থেকে তাঁরা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে উঠেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে সরকার পরিচালনায় চার নেতা বিশেষ প্রজ্ঞা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সব কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন তাঁরা। সেনাবাহিনী সংগঠিত করা, যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা, অস্ত্র সংগ্রহ করা—এসব এক ধরনের কাজ। ভারতে শরণার্থীরা যাতে বেঁচে থাকতে পারে, দেশের মানুষের মনোবল জোরদার হয়, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে ঠিকমতো যোগাযোগ থাকে—তা আরেক ধরনের দায়িত্ব। বিদেশি সরকার ও সহায়ক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা, বাঙালি কূটনীতিকদের সংগঠিত করা—এসব আবার আরেক ধরনের কাজ। স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনের পরিকল্পনাও ছিল তাঁদের মাথায়। যুদ্ধের পুরোটা সময় অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন চার নেতা। তাজউদ্দীন আহমদ বাস করেছেন পরিবারবিচ্ছিন্ন হয়ে

অফিসসংলগ্ন একটি কক্ষে। প্রধানমন্ত্রী হয়েও নিজের কাপড়–চোপড় নিজে ধুয়েছেন। সেই সংকটের কালে চার নেতার ত্যাগ, মনোবল ও দেশপ্রেম সকলকে মুগ্ধ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর প্রেরণা–উদ্দীপ্ত জনগণকে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে তাঁরা স্বাধীনতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করেন।

একাত্তরের বিজয়ের পর শুরু হয় বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের সংগ্রাম। কিন্তু চার বছর না যেতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ষড়যন্ত্রকারীরা নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। কারারুদ্ধ করা হয় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামানকে।

এরপর ৩রা নভেম্বর কারাগারের ভেতরে ঘটে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। আইন ও ন্যায়ের সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়ে অস্ত্রধারী ঘাতকেরা প্রবেশ করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। নিউ জেল বিল্ডিং–এর এক নম্বর সেলে আটক হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ। অপর দুই নেতাকেও আনা হয় এই সেলে। চার নেতাকে একত্র করার পর মুহূর্তে ঘাতকদের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে ওঠে। চৌকির ওপর গড়িয়ে পড়েন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও কামারুজ্জামান। মাটিতে ঢলে পড়ে যান তাজউদ্দীন আহমদ ও এম.মনসুর আলী। রক্তাক্ত দেহে মনসুর আলী কাতরাচ্ছিলেন 'পানি, পানি' বলে। তাই শুনে ঘাতকদল এগিয়ে এসে বারবার বেয়নেটের খোঁচায় বিদ্ধ করে তাঁর শরীর।

স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ঘাতকেরা আঘাত করল মুক্তিযুদ্ধের চার কাণ্ডারিকে। দেশের মানুষের কল্যাণে যাঁরা জীবনভর একত্রে কাজ করেছেন, অভিন্ন আদর্শে যাঁরা ছিলেন অনুপ্রাণিত, মৃত্যু তাঁদের যেন একই মালায় গেঁথে তুলল। তাঁদের জীবন ও মৃত্যু, তাঁদের দেশপ্রেম ও ত্যাগ হয়ে উঠেছে অনিঃশেষ প্রেরণার মহাপ্রবাহ। তাঁরা আমাদের জাতীয় চার নেতা—তাঁরা মৃত্যুহীন, অমর।

পাঠ–পরিচিতি

বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা–উত্তর দেশ পুনর্গঠনে যে চারজন জাতীয় নেতা স্মরণীয় অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান। ২৬শে মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সেনাদের হাতে বন্দি হন এবং তাঁকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে কারারুদ্ধ করে রাখা হয় । বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর আদর্শ ও প্রেরণায় বলীয়ান হয়ে এ চারনেতা মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতিকে তাঁরা নিয়ে যান স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। তাঁরা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক সহচর। দেশকে তাঁরা ভালোবাসতেন। তাঁরা ছিলেন অকুতোভয় দেশপ্রেমিক এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম উজ্জীবনী শক্তি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই স্বাধীনতা–বিরোধী অশুভ শক্তি তৎপর হয়ে ওঠে। তারা প্রথমে নির্মমভাবে হত্যা করে জাতির জনক ও তাঁর বাড়িতে উপস্থিত সকল সদস্যকে। ইতিহাসের এই কলঙ্কময় ও মর্মন্তুদ ঘটনার জের কাটতে না কাটতেই তিন মাস পরে কারারুদ্ধ এই চারজন জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫–এ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ড ছিল যেমন একটি জঘন্য অপরাধ, তেমনি পৈশাচিক ও অমানবিক।

পৃথিবীর ইতিহাসের শিক্ষা হল এই, যারা ষড়যন্ত্রকারী তারা নিমজ্জিত হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, আর যাঁরা দেশমাতৃকার সেবায় জীবনদান করেন তাঁরা দেশবাসীর হৃদয়ে চির–জাগরুক ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। বঙ্গবন্ধুর চার সহচর এই দেশপ্রেমিক চার নেতা তেমনিভাবে বাঙালির মনের মুকুরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রতিরোধ – বাধা।

মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা – ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শপথ নেয় মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলা গ্রামে। এ গ্রামের নাম এখন মুজিবনগর। মুজিনগর বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম – বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রনায়ক। ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে কিশোরগঞ্জ জেলার যশোদল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেন তিনি। আয়কর কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু। পরে ১৯৫১ সালে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনি বন্দি হন এবং বন্দি অবস্থাতেই ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ সালে কারাগারে নির্মমভাবে নিহত হন।

তাজউদ্দীন আহমদ – বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অগ্রনায়ক। ১৯২৫ সালের ২৩শে আগস্ট গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৬৪ সালে জেল থেকে পরীক্ষা দিয়ে আইন পাশ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য হন। ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের পর তাঁকে কঠিন সময়ের মোকাবেলা করতে হয়। মুক্তিবাহিনী গঠন, অস্ত্রসংগ্রহ, আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মুক্ত স্বদেশে তাজউদ্দীন আহমদ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার এক সপ্তাহ পরে তিনি বন্দি হন এবং ৩রা নভেম্বর কারাগারে নির্মমভাবে নিহত হন।

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী – বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর থানার কুড়িপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. এবং পরবর্তী সময় আইন পাশ করেন। ১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য তিনি কারা নির্যাতন ভোগ করেন। ১৯৭০–এর নির্বাচনে তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১–এর এপ্রিলে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তিনি অর্থ, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভায় তিনি প্রথমে যোগাযোগ মন্ত্রী ও পরে স্বরাষ্ট্র ও যোগযোগ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার গঠিত হলে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বঙ্গবন্ধু হত্যার এক সপ্তাহ পর তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মমভাবে নিহত হন।

এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান– একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। ১৯২৫ সালে রাজশাহী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ স্নাতক এবং ১৯৫৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। স্বাধীন বাংলাদেশের তিনি স্বরাষ্ট্র, সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এবং পরে বাণিজ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি পরবর্তী সময়ে শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অন্য তিন জাতীয় নেতার মতো তিনিও গ্রেফতার ও বন্দি হন। ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় নির্মমভাবে নিহত হন।

বিস্তীর্ণ হাওড় এলাকার উদার পরিবেশ–কিশোরগঞ্জ জেলায় রয়েছে বিশাল হাওড় এলাকা। অঞ্চলটি নদীবহুলও বটে। বাংলার লোকগাথা–সাহিত্যে সমৃদ্ধ এ জনপদ। মলুয়া, মহুয়া, বীরাজ্ঞানা সখিনার কাহিনী গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে। প্রকৃতির ঔদার্যের সঙ্গে সাহিত্যের চারণক্ষেত্র হিসেবে এখানে সৃষ্টি হয়েছে একটা উদার মানবিক পরিবেশ। এ অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করেছেন অনেক কবি–সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁদের একজন।

যেন বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিরও প্রতিনিধিত্ব করছেন–বাংলাদেশের জাতীয় চারনেতা এসেছেন এদেশের চার অঞ্চল থেকে। কিশোরগঞ্জের হাওড় এলাকার মানুষ সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তাজউদ্দীন আহমদ বড় হয়েছেন গাজীপুরের ভাওয়াল গড়ের শ্যামল বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে। এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এসেছেন পদ্মা–মহানন্দা বিধৌত বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে। আর এম. মনসুর আলী এসেছেন যমুনার নির্মল তীর থেকে। এভাবে বাংলাদেশের প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতিনিধি হিসেবেই যেন তারা সারাজীবন এদেশের মানুষের কথা বলেছেন, সংগ্রাম করেছেন, দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। সর্বোপরি মানুষের কল্যাণে বিসর্জন দিয়েছেন নিজেদের জীবন।

সংগ্রামের মহানায়ক – বাঙালির দীর্ঘদিনের সংগ্রামে যিনি বলিষ্ঠ সাহস, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়ে অনন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা—তাই তিনি মহানায়ক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার কত তারিখে গঠিত হয়?

ক. ১৫ই এপ্রিল খ. ১৬ই এপ্রিল
গ. ১৭ই এপ্রিল ঘ. ১৮ই এপ্রিল।

২. 'চার নেতা যেন বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করছেন'–এখানে 'বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি' বলতে বোঝানো হয়েছে–

i. উদার প্রকৃতি ii. নানাবর্ণের প্রকৃতি
iii. বিচিত্র প্রকৃতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, iii খ. ii ও iii
গ. ii ঘ. iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নম্বর থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

'আজ এই আম্রকাননে একটি নতুন জাতি জন্ম নিল। আমরা লড়াইয়ে নেমেছি। এ লড়াইয়ে আমাদের জয় অনিবার্য।'

৩. উপরের বক্তব্যটি কার?

ক. সৈয়দ নজরুল ইসলামের খ. তাজউদ্দিন আহমদের
গ. ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলীর ঘ. আবুল হাসনাত মোহাম্মাদ কামারুজ্জামানের

৪. ‘এ লড়াইয়ে আমাদের জয় অনিবার্য’–এ বাক্যে কী প্রকাশ পায়?
ক. বীরত্ব খ. দৃঢ়তা
গ. আকাঙ্ক্ষা

৫. উদ্দীপকের ‘আম্রকানন’ কোথায় অবিস্থত?
ক. মেহেরপুর খ. চুয়াডাঙ্গা
গ. কুষ্টিয়া ঘ. ঝিনাইদহ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় চার নেতা এসেছিলেন এদেশের চার অঞ্চল থেকে। একজন এসেছেন বিস্তীর্ন হাওড় এলাকার উদার পরিবেশ থেকে। আরেকজন লালিত হয়েছেন ভাওয়াল গড়ের বনরাজির শ্যামল ছায়ায়। দুই প্রধান নদী পদ্মা ও যমুনার তীরে কেটেছে অপর দুজনের শৈশব। জাতীয় চার নেতা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছেন আবার নিহতও হয়েছেন একসঙ্গে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্বাধীন বাংলার মাটিতে তাঁদের পবিত্র রক্ত একসঙ্গে মিশে গেছে। এ মিলনকে জাতীয় চার নেতা প্রবন্ধে বলা হয়েছে–‘চার নেতার আত্মদান মিলেছে এক মোহনায়’।

ক. বিস্তীর্ণ হাওড় অঞ্চলে জন্ম কোন জাতীয় নেতার?
খ. বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?
গ. জাতির ক্রান্তিলগ্নে জাতীয় নেতার কীভাবে দায়িত্ব পালন করা উচিত বলে তুমি মনে কর।
ঘ. ‘চার নেতা এসেছিলেন এদেশের চার অঞ্চল থেকে’ এবং ‘চার নেতার আত্মদান মিলেছে এক মোহনায়’–কথা দুটির ভাবার্থ বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘটিত জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড একটি জঘন্য অপরাধ ও অমানবিক ঘটনা। ইতিহাসের শিক্ষা হল যারা ষড়যন্ত্রকারী তারা নিমজ্জিত হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে আর যাঁরা দেশের জন্য জীবন দান করেন তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। বঙ্গবন্ধুর এই চার সহচর তেমনিভাবে আমাদের মনের মুকুরে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ক. কত তারিখে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়?

খ. যারা ষড়যন্ত্রকারী তারা নিমজ্জিত হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে–কথাগুলো ব্যাখ্যা কর।

গ. ‘যাঁরা দেশের জন্য জীবনদান করেন তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন’ ইতিহাসের এই শিক্ষা জাতীয় চার নেতার ক্ষেত্রে কতটুকু ঠিক? জাতীয় চার নেতা প্রবন্ধের আলোকে লেখ।

ঘ. জাতীয় নেতারা আমাদের মনের মুকুরে কীভাবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তা বিশ্লেষণ কর।

শারীরিক পরিশ্রম

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান



সংসারের কাজগুলো যদি তুমি নিজের হাতে করতে শেখ তা হলে তোমার জীবনের মর্যাদা বেড়ে যাবে। হাতে কাজ করায় অগৌরব নেই। অগৌরব হয় মিথ্যায়, মূর্খতায় আর নীচতায়।

এক ব্যক্তি এক দিন আমার কাছে গৌরব করে বলেছিলেন—"আমি কোনো দিন বাজারে যাইনি।" তিনি যে এক জন অপদার্থ ব্যক্তি, তাতে আর সন্দেহ নেই।

বেড়া বাঁধা ও ঘর ছাইতে জানা, ঝাড়ন–ঝাঁটা বাঁধতে পারা, এসব গুণ বই দোষ নয়। কাজ জান না বলে তুমি যদি গৌরব কর, তা হলে বলব, তুমি মূর্খ।

সম্মান হয় কিসে ? জ্ঞান, চরিত্র ও মনুষ্যত্বে। সংসারে কাজ না জানার মধ্যে সম্মান নেই।

তোমার আর্থিক অবস্থা খারাপ। তুমি সাধু, তুমি মহৎ, তুমি জ্ঞানী—তুমি সংসারের কাজ করতে লজ্জাবোধ কর না—এ তোমার হীনতা নয়, বরং গৌরব। তুমি মানবসমাজের গৌরব।

কোনো এক স্কুলের ছেলেরা ডিসেম্বর মাসে ধান কেটে যে পয়সা পেত, তা গরিব ছাত্রদেরকে দান করত। এ দৃষ্টান্ত কি খুব মহৎ নয় ? গ্রামের ভেতর এক দুঃখীর ঘর দিয়ে বর্ষার জল পড়ে—আহা কী কষ্ট ! তোমরা দশ জন মিলে তার ঘরখানা যদি সেরে দাও, তা হলে তোমাদের সম্মান কমে যাবে না। তাতে বরং তোমাদের হৃদয়বল ও মনুষ্যত্বই প্রকাশ পাবে।

মহৎ হতে চেষ্টা কর। অপদার্থ মানুষকে অনুকরণ করে নিজের মনুষ্যত্বকে হীন কর না। শুধু অর্থ ও সম্পদের সামনে তোমার মাথা যেন নত না হয়।

এক বার শুনেছিলাম পঞ্চাশ–ষাট জন স্কুলের ছেলে কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে একটি খাল কেটেছে। একথা শুনলে কার না মন খুশি হয় ? জনৈক মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে শহরের কুলি–মজুর শ্রেণীর লোকের কাছে সুই, সুতা, চা প্রভৃতি বেচতে দেখেছি। স্বভাবে তাঁর কিছুমাত্র অহংকার নেই—এমন লোক মানবজাতির শ্রদ্ধার পাত্র।

যখন তুমি স্কুলের বালক, তখন পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অনেক কাজ শিখে রাখতে পার। ছোট একটি বাক্সে একটি হাতুড়ি, একটি বাটালি, একখানা করাত তোমার বইয়ের পাশে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। বৈজ্ঞানিক নিউটন যখন বালক, তখন তাঁর বইয়ের পাশে হাতুড়ি, করাতের স্থান ছিল। পড়তে মন চায় না, হাতুড়ি নিয়ে কাজ কর। তাতে তোমার সম্মানহানি হবে না।

অপদার্থ লোকের সমালোচনাকে ভয় করবে কারা ? যারা চিরকাল ছোট হয়ে থাকবে।

তোমার বাড়ির কাছে কামারের বাড়ি। ক্ষতি কী, যদি তুমি জেনে নাও কেমন করে পোড়ানো গরম লাল লোহার ওপর হাতুড়ি পিটিয়ে তারা নানারকম হাতিয়ার প্রস্তুত করে ?

চাকর আসেনি বলে না খেয়ে ভদ্রলোক সাজতে যেও না ; দাসদাসী না রেখে নিজের কাজ চালানো যদি সম্ভব হয়, তবে তাই ভালো। যার বাড়িতে যত চাকর–দাসী, সে তত ভদ্রলোক—এই বিশ্বাস করা মূর্খতা।

সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য যত প্রকার কাজ শেখা সম্ভব, সেসব শিখে রাখায় আদৌ অমর্যাদা নেই। সত্য ও মনুষ্যত্বের ওপর তোমার মর্যাদার ভিত্তি—একথা সব সময়ে যেন তোমার মনে থাকে।

সংসারে চিন্তাশূন্য বিত্তবান মানুষকে দেখে দমে যেও না। অপেক্ষা কর, মানুষ শেষে তোমারই অনুসরণ করবে।

শব্দার্থ ও টীকা

অগৌরব — অমর্যাদা।

মূর্খতা — শিক্ষাহীনতা, অজ্ঞতা, বুদ্ধিহীনতা, বোকামি।

গৌরব — মর্যাদা, অহংকার, বড়াই।

অপদার্থ — অকেজো, কর্মপটু নয় এমন।

মনুষ্যত্ব — মানবোচিত গুণাবলি।

হীনতা — নীচতা, হেয় অবস্থা।

হৃদয়বল — মনের শক্তি।

অমর্যাদা — অসম্মান, অগৌরব।

অনুকরণ — অন্যের করা কাজের মতো হুবহু কিছু করা, নকল, অন্যের দেখাদেখি কিছু করা।

পাঠ–পরিচিতি

'শারীরিক পরিশ্রম' প্রবন্ধে মর্যাদা ও ব্যক্তিজীবনে শারীরিক পরিশ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। পরিশ্রমই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের যথার্থ হাতিয়ার। শ্রমই মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে, জীবনকে অর্থময় করে তোলে, জীবনের মর্যাদাকে সমুন্নত করে। যে নিজের হাতে দৈনন্দিন কাজ করতে পারে না, সত্যিকার অর্থে তার জীবনের মর্যাদা নেই। যে নিজের কাজ নিজের হাতে করতে লজ্জা পায়, সে মিথ্যা ও নীচতাকেই আশ্রয় করে।

কেউ যদি গৌরব করে বলে যে, সে কোনো দিন বাজারে যায় নি তবে সেটা আদৌ গৌরবের কথা নয়। বরং সে যে পরগাছা ধরনের অপদার্থ লোক, তাতে সন্দেহ থাকে না।

প্রকৃত সাধু, জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তি নিজের হাতে সাংসারিক কাজকর্ম করতে কখনো লজ্জাবোধ করেন না। ছাত্রজীবনে কায়িক পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে সে অর্থ গরিব দুঃখীদের সেবায় দান করলে মানুষের মর্যাদা বাড়ে। ছাত্ররা যদি

সবাই মিলে কোনো দুঃখীর ভাঙা ঘর মেরামত করে দেয়, তাতে অন্যের যেমন কল্যাণ হয়, তেমনি ছাত্রদের হৃদয়বল ও মনুষ্যত্বের মহিমাও প্রকাশিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে খাল কাটায় অংশ নিতে পারে। এতে দেশের উন্নতি হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সব ধরনের সাংসারিক কাজকর্ম করায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত। মহৎ মানুষের জীবনে এ ধরনের কায়িক শ্রমে নিয়োজিত থাকার অনেক উদাহরণ আছে।

যে নিজে অলস, শ্রমবিমুখ, যে দাসদাসী বা অন্যের শ্রমের ওপর বেঁচে থাকে, তার জীবন এক সময় না এক সময় ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরে ওঠে। পক্ষান্তরে, কায়িক পরিশ্রম মানুষকে দেহে ও মনে সুস্থ ও সুন্দর করে তোলে। জীবনকে সমৃদ্ধ করে সার্থকতায়।

জীবনে সব রকমের দৈনন্দিন কাজ নিজ হাতে করতে পারা তাই অত্যন্ত গৌরবের ও আনন্দের।

লেখক-পরিচিতি

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তাঁর অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের আলোকে মানবজীবনের মহান আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই মানুষকে উন্নত জীবন ও মহৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে গেছেন তাঁর 'উন্নত জীবন', 'মহৎ জীবন', 'সত্য জীবন', 'মানব জীবন' ইত্যাদি গ্রন্থে। এসব গ্রন্থ ছাড়াও তিনি কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন।

প্রথমে শিক্ষকতা করলেও পরবর্তী জীবনে তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন। নারীসমাজের উন্নতির জন্য 'নারীতীর্থ' নামে সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও 'নারীশক্তি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

লুৎফর রহমানের জন্ম মাগুরা জেলার পারনান্দুয়ালী গ্রামে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

লুৎফর রহমান কয়েকটি শিশুতোষ গ্রন্থও লিখেছেন। এগুলো হল : 'রানী হেলেন', 'ছেলেদের মহৎ কথা' ও 'ছেলেদের কারবালা।'

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনো কাজ যদি তুমি নিজ হাতে করতে শেখ তা হলে তোমার মর্যাদা বেড়ে যাবে?

ক. সংসারে খ. পরিবারে

গ. সমাজে ঘ. ঘরে

২. 'শারীরিক পরিশ্রম' প্রবন্ধের লেখক—

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

গ. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঘ. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মহৎ হতে চেষ্টা কর। অপদার্থ মানুষকে অনুকরণ করে নিজের মনুষ্যত্বকে হীন কর না। শুধু অর্থ ও সম্পদের সামনে তোমার মাথা যেন নত না হয়।

৩. 'মহৎ হতে চেষ্টা কর' লেখক একথাটি কাদের বলেছেন?

ক. মূর্খদের খ. অপদার্থদের

গ. ছাত্রদের ঘ. কুলি–মজুরদের

৪. অনুচ্ছেদটিতে 'মনুষ্যত্বকে হীন করো না'—কথাগুলোর অর্থ

i. মনকে হেয় না করা

ii. মানবতাকে হেয় না করা

iii. মনের গুণকে হেয় না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং এর আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যখন তুমি স্কুলের বালক, তখন পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অনেক কাজ শিখে রাখতে পার। ছোট একটি বাক্সে একটি হাতুড়ি, একটি বাটালি, একখানা করাত তোমার বইয়ের পাশে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই।...পড়তে মন চায় না, হাতুড়ি নিয়ে কাজ কর। তাতে তোমার সম্মানহানি হবে না।

ক. বালক বয়সে কার বইয়ের পাশে হাতুড়ি করাতের স্থান ছিল?

খ. অনুচ্ছেদটিতে হাতুড়ি, বাটালি, করাতের উল্লেখ রয়েছে—এ যন্ত্রগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে লেখ।

গ. অনুচ্ছেদটিতে উল্লিখিত যন্ত্রগুলো হাতুড়ি, বাটালি, করাত তোমার বইয়ের পাশে থাকলে এগুলো কীভাবে কাজে লাগাতে পারবে? যৌক্তিক উপস্থাপন কর।

ঘ. 'পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অনেক কাজ শিখে রাখতে পার'—কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কোনো এক স্কুলের ছেলেরা ডিসেম্বর মাসে ধান কেটে যে পয়সা পেত, তা গরিব ছাত্রদের দান করত। এ দৃষ্টান্ত কি খুব মহৎ নয়? গ্রামের ভেতর এক দুঃখীর ঘর দিয়ে বর্ষার জল পড়ে যদি—আহা কী কষ্ট! তোমরা দশ জন মিলে তার ঘরখানা যদি সেরে দাও, তা হলে তোমাদের সম্মান কমে যাবে না। তাতে বরং তোমাদের হৃদয়বল ও মনুষ্যত্বই প্রকাশ পাবে।

ক. উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির লেখক কে?

খ. 'তাতে বরং তোমাদের হৃদয়বল ও মনুষ্যত্বই প্রকাশ পাবে'–এ বাক্যের 'হৃদয়বল' ও 'মনুষ্যত্ব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্ধৃত অংশটিতে যে মহৎ দৃষ্টান্তের উল্লেখ রয়েছে তা কীভাবে ছাত্রসমাজকে প্রেরণা যোগাবে বলে তুমি মনে কর–যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্ধৃতাংশে যে মহৎ গুণের কথা বলা হয়েছে 'শারীরিক পরিশ্রম' প্রবন্ধের আলোকে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।



লন্ডনের জাদুঘরে

মুহম্মদ আবদুল হাই

ইংরেজরা জাতি হিসেবে আত্মসচেতন। তার পরিচয় পাই ইংল্যান্ডের পথেঘাটে। পথ চলতে গিয়ে রংবেরঙের ছোট বড় নানা আকারের মূর্তি দেখি। এ মূর্তিগুলোর কয়েকটা পৌরাণিক, অধিকাংশই ঐতিহাসিক।

সেসব মূর্তির গায়ে তাদের নাম-ধাম, তাদের কীর্তি-খ্যাতি খোদাই করা আছে, এদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ রাজত্ব বিস্তারের জন্য যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। যুদ্ধবিজয়ী কিংবা যুদ্ধে শহীদদের মূর্তি স্মৃতিস্তম্ভই এসবের মধ্যে সংখ্যায় বেশি।

ইংরেজদের ইতিহাস-প্রীতির কথা বলতে গেলে শুধু মূর্তি কিংবা ভাস্কর্যেই তার পরিচয় শেষ হয় না। স্থান বিশেষে ইতিহাসকে জীবন্ত ও জাগ্রত করে রাখবার প্রয়াসও এদের কম নয়। তার দৃষ্টান্ত দেখি এদের মিউজিয়াম বা জাদুঘরগুলোতে। টাওয়ার অব লন্ডন এমনি এক স্থায়ী অস্ত্র প্রদর্শনী। প্রাচীনকাল থেকে এ কাল পর্যন্ত এক এক যুগের সৈন্যরা কী সাজে সেজেছে, কী অস্ত্র ব্যবহার করেছে, কী অসুবিধায় পড়েছে, সে অসুবিধা থেকে বাঁচবার জন্য পরবর্তী যুগে কী উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে-বইয়ের পাতায় তাকে নিবদ্ধ না রেখে এখানে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবসরমতো ছেলেবুড়ো সকলে তা দেখছে। শিক্ষিতদের স্মৃতির এতে হচ্ছে ঝালাই, আর বইয়ের পাতা মানুষের চোখের সামনে আপনাকে আপনিই যেন মেলে ধরেছে। মানুষ না শিখে যাবে কোথায়? আর দেখে শিখে ভুলবেই বা সে কী করে ? ইতিহাসের পুরনো পাতা চোখের সামনে যখন এমনি করে ভেসে ওঠে, তখন মানুষের অজ্ঞাতসারেই নতুন ইতিহাস আপনা থেকেই রচিত হয়ে যায়। লন্ডনে মিউজিয়াম কি একটা দুটো ? না একই ধরনের ? ছোটখাটো মিউজিয়াম তো বেশুমার। বড় মিউজিয়ামের সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সাইন্স মিউজিয়াম, ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়াম আর ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখবার মতো। বৃহত্ত্বের দিক দিয়ে সারা ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জুড়ি নেই। জায়গার অভাবে এখানকার প্রদর্শনীয় জিনিসপত্রের কিছুটা ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের নানা ভাগ উপভাগ রয়েছে; ভারতীয়, চৈনিক, মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শনগুলো এ মিউজিয়ামের অন্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছি এ বিভাগে মানব-সভ্যতার চার হাজার বছর আগেকার নিদর্শন। সেকালের কাঠকুটোর তৈরি জিনিস, ছোট ছেলের পায়ের জুতো আর সবার ওপরে মিশরের মমি। মমি অর্থাৎ সেকালের মিশরীয় রাজরাজড়া, রাজকন্যা ও রাজরানীদের সুরক্ষিত মৃতদেহ।

সেকালেরই কাপড়–চোপড় জড়ানো। এমনভাবে ভাঁজে ভাঁজে কাপড়–চোপড় জড়িয়ে রাখা হয়েছে যে, দেখে মনে হবে, যেন জীবন্ত মানুষই সটান হাত–পা ছড়িয়ে ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে আমি অনাদি অতীতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি মনে নেই। দেখলাম সেই অনাদিকালের মানবসভ্যতার ধারা যুগে যুগে এক জাতির মানুষের ভেতর দিয়ে আপনাকে রচনা করে দিয়ে যাচ্ছে। বিস্তারিত করে দিচ্ছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পর নাম করতে হয় 'মাদাম তুসো'র (Madam Tussud)। বিভিন্ন দেশের অতীত সভ্যতাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। আর মাদাম তুসোর মিউজিয়ামটাও অনেকটা সেইরকম। তবে তফাত এই যে, অন্যান্য মিউজিয়ামে যেখানে সুদূর অতীতই প্রাধান্য লাভ করেছে, মাদাম তুসোতে সেখানে অদূর অতীত আর পলায়নপর বর্তমান নিয়ে কারবার। মাদাম তুসোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে চিত্রের বা ভাস্কর্যের ঠাঁই নেই। আছে শুধু মোমের মূর্তি। মাদাম তুসো নাম্নী এক ফরাসি ভদ্রমহিলা এ কারুশিল্পের গোড়াপত্তন করেন। তাঁরই নাম অনুসারে এ প্রদর্শনীটির নামকরণ করা হয়েছে।

এখানে বর্তমান ও অদূর অতীতের ঐতিহাসিক নায়ক–নায়িকাদের মোমের মূর্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে। বিস্মিত হতে হয় শিল্পীমনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখে। দৈনন্দিন জীবনে যে ভঙ্গি যাঁর সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং বহুল পরিচিত, তাঁকে তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে মোমের মাধ্যমে ধরে দেওয়া হয়েছে। মাথার চুল, চোখের চাউনি, মুখের ভঙ্গি, পোশাকের বিশিষ্টতা, সব নিয়ে বিশিষ্ট মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে শিল্পীর মনোজগতে ধরা পড়ে এখানে বন্দি হয়ে গেছেন। অনেক জানা মানুষকে এখানে মোমের মূর্তিতে রূপায়িত হতে দেখে হঠাৎ বিস্মিত হতে হয়।

একালের বিশ্ববিখ্যাত নেতাদের সকলেই আছেন। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের সকলেরই থাকবার কথা। সেজন্যে তাঁরা তো আছেনই, একালের রানী এলিজাবেথ এবং রাজপরিবারের গণ্যমান্য সকলেই স্ব–মহিমায় আসন পেয়েছেন। হিটলার, মুসোলিনী প্রমুখ নেতাও বাদ যাননি।

এই জায়গায় এসে দেখছি রূপকথার নিদ্রিতা সুন্দরী সেই 'Sleeping Beauty'–কে। তনুদেহ মেলে দিয়ে কত কাল ধরে ঘুমিয়ে আছেন তিনি, স্বপনপুরীর কোন রাজপুত্রের প্রতীক্ষায়। তাঁর ক্ষীণ শরীর ছেয়ে স্নিগ্ধ কোমলতা যেন পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম সরু কাপড়ে তাঁর দেহলতা সুশোভিত। তাঁকে নিশ্বাস নিতে দেখা যাচ্ছে, শ্বাস–প্রশ্বাসের সুচারু যান্ত্রিক আয়োজনের ভেতর দিয়ে। মনে হচ্ছে তাঁর নিঃশ্বাসে একটা সুমধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে নিষেধ আছে।

মাদাম তুসো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। দরজার সামনে পুলিশের পোশাক পরা প্রহরী দেখছি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। সে কি সত্যিকার মানুষ না মোমের তৈরি বুঝতে পারছি না। দেখতে দেখতে আমি নিশ্চুপ হয়ে গেছি। এমন সময় দশ–বার বছরের গোটা দুই ইংরেজ মেয়েকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তারা কিম্ভূতকিমাকার আধাকালো এই আমাকে দেখে মূর্তি ঠাউরে যেই না আমাকে স্পর্শ করেছে, অমনি আমি সচকিত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছি। বেচারিদের ভুল ভাঙতেই তারা হতচকিত হয়ে ছুট দিয়েছে। আমি মনে মনে হেসে উঠলাম। সামনে পাহারারত মোমের পুলিশটিকে নিয়ে আমার যে দশা, আমাকে নিয়ে ওদেরও সে দশা হয়েছিল। ওদের ভুল ভাঙল আমাকে নড়ে উঠতে দেখে। আর পুলিশটিকে স্পর্শ করে আমার ভুল ভাঙল যে, সে মূর্তিই—মানুষ নয়।

লন্ডনের Natural History Museum সত্যি মানুষকে মুগ্ধ করে দেওয়ার মতো। প্রাকৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস যেন এ মিউজিয়ামে জীবন্ত রূপ ধরেছে। জীব–জানোয়ার, পশুপাখি তার আদিমতম অবস্থা থেকে কীভাবে বর্তমান রূপে এসে দাঁড়িয়েছে, এখানে এক দৃষ্টিতে তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। প্রত্যেক জীবজন্তুকেই রাখা হয়েছে তার জীবনের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, সেই পরিবেশকে যথাযথ সৃষ্টি করে। মানুষ কী করে ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে পারে, তার আর একটি বাস্তব নিদর্শন পেলাম এই প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রদর্শনীতে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী জন্মায়। তারা এখানে স্থান পেয়েছে তাদের স্বদেশের পরিবেশে। ছোট ছোট প্রাণী থেকে বৃহৎ প্রাণীর কেউ বাদ যায়নি। এক এক রকম 'স্পিশিজ' (Species) বা গোত্রভুক্ত প্রাণীর হাড়গোড় তো আছেই,

তারপর তাদের মৃতদেহকে স্বকীয় পরিবেশে জীবন্ত করা হয়েছে। তারা যে মৃত, প্রথম দৃষ্টিতে তা সহজে বোঝা যায় না। দেখছি হাতি, ঘোড়া, হরিণ, জিরাফ, বাঘ, সিংহ, শেয়াল, বেবুন সবই আছে। জীবজগতের ইতিহাসের বিবর্তন কীভাবে বর্তমান রূপ পেল, তা বই পড়ে শিখবার চাইতে এখানে এসে একবার দেখে ভালো করে জানা যায়। তাতে পরোক্ষ নয় বরং প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।

Science Museumটি কিন্তু ভিন্ন ধাঁচের। এখানে ইতিহাস ও ভূগোলপ্রীতি নেই। আছে বিজ্ঞানসাধনার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এ যুগটাই বিজ্ঞানের যুগ। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। তাতে ইংরেজদের অবদান কম নয়। এ যুগে দুনিয়াতে চলতে গেলে প্রত্যেক মানুষেরই যাতে বিজ্ঞানে প্রাথমিক জ্ঞান হয়, এ মিউজিয়ামটি মূলত সেই প্রেরণায় সৃষ্টি। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তাদেরও অনেকে বিজ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল নয়। দোষ দিই নে তাদের। কারণ, বই পড়ে শিখতে গিয়ে কোনোটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, কোনোটা বা মাস্টারের হাত থেকে ফসকে গেছে। ফলে বিদ্যা হয়েছে কেতাবি; প্রত্যক্ষ জ্ঞানগোচর নয়। প্রাথমিক জ্ঞানে যে প্রত্যেক মানুষেরই একটা সাধারণ অধিকার রয়েছে, তার একটা সুরাহা হয়েছে এখানে। কিসের থেকে কী আবিষ্কার হল, কোন যন্ত্রে কী হয়, যন্ত্রপাতি কী করে ব্যবহার করতে হয়, এখনকার ছোট ছোট ছেলেপুলেরা পর্যন্ত অবসর বিনোদনের জন্য এখানে এসে নেড়েচেড়ে তা শিখতে পারছে। এক জায়গায় দেখছি ছাদ থেকে একটা বিরাট পেন্ডুলাম ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার নিচে মেঝেতে এঁকে রাখা হয়েছে একটা বিরাট ঘড়ি। সকালে এসে দেখা যায় পেন্ডুলামটি হয়তো আটটা বরাবর ঝুলছে। দুপুরে এসে এই পেন্ডুলামটিকেই ঝুলতে দেখছি বারোটার দাগ বরাবর। পৃথিবী যে অনবরত ঘুরছে, এর চেয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ সাধারণের কাছে আর কী হতে পারে।

(সংক্ষেপিত ও নির্বাচিত)

শব্দার্থ ও টীকা

আত্মসচেতন — নিজের বা নিজেদের সম্পর্কে সজাগ।

পৌরাণিক — পুরাণে বর্ণিত, পুরাণবিষয়ক, প্রাচীন কাহিনীতে বর্ণিত।

স্মৃতিস্তম্ভ — স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্মিত স্তম্ভ।

ভাস্কর্য — ভাস্করের কাজ বা শিল্প, মূর্তিশিল্প, পাথর কুঁদে মূর্তি নির্মাণ করার শিল্প।

বেশুমার — যা শুমার বা গণনা করা যায় না, অসংখ্য, অগণিত।

সটান — সোজা, টানটান হয়ে।

অনাদি — যার আদি বা আরম্ভ নেই, স্মরণাতীত।

মাদাম তুসো — মোম দিয়ে অবিকল মূর্তি তৈরিতে পারদর্শী মহিলা শিল্পী। পুরো নাম মেরি তুসো (১৭৬০-১৮৫০)। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডনে তাঁর নিজস্ব মোমের কাজের জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন।

পর্যবেক্ষণ — মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা।

হিটলার — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ফ্যাসিবাদী সমরনায়ক। পুরো নাম আডল্‌ফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫)।

মুসোলিনি — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির সমরনায়ক ও স্বৈরাচারী শাসক। পুরো নাম বেনিতো মুসোলিনি (১৮৮৩-১৯৪৫)।

তনুদেহ — সুন্দর ও কোমল শরীর, সুন্দর ও ছিপছিপে দেহ।

কিম্ভূতকিমাকার — অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট।

ঠাউরে — স্পর্শ করে বা দেখে অনুমান করা বা চেনা।

স্পিশিজ — প্রজাতি, কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের শ্রেণীগত বিশেষ ভাগ।

স্বকীয়	—	নিজস্ব।
বিবর্তন	—	ক্রমবিকাশ, ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নতি।
ওয়াকেফহাল	—	খবরাখবর রাখে এমন, সব কিছু সম্পর্কে অভিজ্ঞ।
সুরাহা	—	সমাধান, সুবন্দোবস্ত, সুব্যবস্থা।
পেন্ডুলাম	—	দোলক।
জাদুঘর	—	বিশেষভাবে সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহশালা।

পাঠ–পরিচিতি

লেখক যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে ছিলেন প্রায় দু বছর। সেখানে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার জাদুঘরগুলো দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। এই রচনায় তাঁর সেই অভিজ্ঞতারই বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। ইংরেজদের ইতিহাস সচেতনতার নানা পরিচয় তিনি দেখেছেন সেখানে। পথেঘাটে নানা মূর্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ এবং সেগুলোর গায়ে খোদাই করা পরিচিতি ইংরেজ জাতির নানা ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আছে।

তাদের ইতিহাস সচেতনতার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত সেখানকার জাদুঘরগুলো। এরকম একটি জাদুঘর হচ্ছে সেখানকার স্থায়ী অস্ত্র প্রদর্শনী 'টাওয়ার অব লন্ডন'। প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের বিবর্তনের নিদর্শন এখানে রয়েছে।

লন্ডনে মিউজিয়াম আছে অনেকগুলো। তবে সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত মিউজিয়াম হচ্ছে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মাদাম তুসো মিউজিয়াম, ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়াম ও সাইন্স মিউজিয়াম। এগুলোর মধ্যে আবার সবচেয়ে বড় ব্রিটিশ মিউজিয়াম। এখানে রয়েছে মানবসভ্যতার চার হাজার বছরের আগেরকার ধারাবাহিক নিদর্শন।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তুসো মিউজিয়াম। এখানে রয়েছে নিকট–অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের নানা নিদর্শন। তবে এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এখানে রয়েছে নিকট–অতীত ও বর্তমান কালের বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের মোমের মূর্তি। দেখে যেন মনে হয় একেবারে জীবন্ত। আর রূপকথার নিদ্রিতা সুন্দরী রাজকন্যার মূর্তির দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। এই মূর্তিগুলো এত জীবন্ত যে, দর্শনার্থীরা কখনো কখনো জীবন্ত লোককে মূর্তি বলে ভুল করেন। কোনটি মূর্তি আর কোনটি জীবন্ত মানুষ তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

লন্ডনের প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘরে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাসকে যেন জীবন্ত করে রাখা হয়েছে। প্রতিটি প্রজাতিকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার স্বকীয় পরিবেশসুদ্ধ।

বিজ্ঞান জাদুঘর একটু ভিন্ন ধাঁচের। এখানে বিজ্ঞানের নানা নিদর্শন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি আবিষ্কারের পন্থা, প্রতিটি যন্ত্রের ব্যবহারপদ্ধতি এমনভাবে এখানে প্রদর্শিত হয়েছে যে, সব বয়সের শিক্ষার্থীরা এগুলো সম্পর্কে চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

লেখক–পরিচিতি

উপমহাদেশের অন্যতম ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আবদুল হাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন গবেষক, সমালোচক ও প্রবন্ধকার হিসেবে।

তাঁর জন্ম ১৯১৯ সালের ২৬শে নভেম্বর, পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা গ্রামে। ছাত্রজীবনে কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন তিনি। পেশা হিসেবে বেছে

নিয়েছিলেন অধ্যাপনা। ১৯৬৯ সালের ৩রা জুন এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

১৯৫২ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে তাঁর সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্র 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধরচনা ও গবেষণার জন্য তিনি 'বাংলা একাডেমী' পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ধ্বনিবিজ্ঞান নিয়ে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন। এ ছাড়া ১৭টি গ্রন্থও তিনি সম্পাদনা করেন। অধ্যয়নসূত্রে ইংল্যান্ডে থাকাকালে সেখানকার অভিজ্ঞতার আলোকে 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' বইটি রচিত। এটি মূলত ভ্রমণকাহিনী।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাদাম তুসো কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

ক. জাপানের খ. জার্মানের
গ. ইতালির ঘ. ফ্রান্সের

২. লন্ডনের বিখ্যাত কতগুলো মিউজিয়ামের নাম হচ্ছে—

i. ব্রিটিশ মিউজিয়াম
ii. মাদাম তুসো মিউজিয়াম
iii. ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়াম

উল্লিখিত মিউজিয়ামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়—

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ঘ. iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩–৫ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

এক জায়গায় এসে দেখছি রূপকথার নিদ্রিতা সুন্দরী সেই Sleeping Beauty-কে। তনুদেহ মেলে দিয়ে কতকাল ধরে ঘুমিয়ে আছেন তিনি স্বপনপুরীর কোন রাজপুত্রের প্রতীক্ষায়। তাঁর ক্ষীণ শরীর ছেয়ে স্নিগ্ধ কোমলতা যেন পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম সরু কাপড়ে তাঁর দেহলতা সুশোভিত। তাঁকে নিঃশ্বাস নিতে দেখা যাচ্ছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সুচারু যান্ত্রিক আয়োজনের ভিতর দিয়ে। মনে হচ্ছে তাঁর নিঃশ্বাসে একটা সুমধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে নিষেধ আছে।

৩. অনুচ্ছেদটি একটি

ক. নাটকের অংশ খ. প্রবন্ধের অংশ
গ. গল্পের অংশ ঘ. ভ্রমণকাহিনীর অংশ

৪. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে

ক. ভাস্কর্য মূর্তির কথা খ. মোমের মূর্তির কথা
গ. কৃত্রিম মানুষের কথা ঘ. বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার কথা

৫. 'তাঁর ক্ষীণ শরীর' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে—

i. দুর্বল দেহ
ii. রুগ্‌ণ দেহ
iii. সুন্দর দেহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. i ও ii

গ. iii　　ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আর মাদাম তুসোর মিউজিয়ামটাও অনেকটা সেইরকম। তবে তফাত এই যে, অন্যান্য মিউজিয়ামে সুদূর অতীতই প্রাধান্য লাভ করেছে, মাদাম তুসোতে সেখানে অদূর অতীত আর পলায়নপর বর্তমানকে নিয়ে কারবার। মাদাম তুসোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে চিত্রের বা ভাস্কর্যের ঠাঁই নেই। আছে শুধু মোমের মূর্তি।

ক. 'অনেকটা সেইরকম' বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে।

খ. 'মাদাম তুসো' মিউজিয়ামের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

গ. তোমার দেখা কোনো জাদুঘরের সঙ্গে লন্ডনের জাদুঘরে কী সাদৃশ্য রয়েছে–বর্ণনা কর।

ঘ. মাদাম তুসো মিউজিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য মিউজিয়ামের পার্থক্য লন্ডনের জাদুঘর প্রবন্ধের আলোকে তুলে ধর।

২. বই পড়ে শিখতে গিয়ে কোনোটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, কোনোটা বা মাস্টারের হাত থেকে ফসকে গেছে। ফলে বিদ্যা হয়েছে কেতাবি, প্রত্যক্ষ জ্ঞানগোচর নয়। প্রাথমিক জ্ঞানে যে প্রত্যেক মানুষেরই একটা সাধারণ অধিকার রয়েছে, তার একটা সুরাহা হয়েছে এখানে। কিসের থেকে কী আবিষ্কার হল, কোন যন্ত্রে কী হয়, যন্ত্রপাতি কী করে ব্যবহার করতে হয়, এখানকার ছোট ছোট ছেলেপুলেরা পর্যন্ত অবসর বিনোদনের জন্য এখানে এসে নেড়েচেড়ে তা শিখতে পারছে।

ক. 'তার একটা সুরাহা হয়েছে' বলতে কিসের কথা বলা হয়েছে?

খ. অনুচ্ছেদটিতে 'কেতাবি বিদ্যা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. জ্ঞানবিকাশের জন্য ছাত্র–ছাত্রীগণ জাদুঘর কীভাবে ব্যবহার করতে পারে যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. 'জাদুঘর শুধু বিনোদনের জন্য নয়, জ্ঞানের জন্যও'–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

ইনসানিয়াত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



পদ্মা নদী দিয়ে স্টিমারে চলেছি। ডেকের এক কোণে সামনা-সামনি বিছানা পেতে আমরা দুই ভাই বসে। কিছু বই পড়া, কিছু তীরের দৃশ্য বা নদীতে ইলিশ মাছ ধরা এবং ডিঙির বহর দেখে সময় কাটাতে হবে। সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের আলো সারা আকাশকে আবির রঙে রাঙিয়ে দিল। শান্ত মনে ঐ সমস্ত দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। আমি বিছানা পেতেছিলাম এক পাশে—আমার পরেই কেবিনের কাঠের দেয়াল। সামনে লোক চলাচলের জন্য একটুখানি জায়গা, তার ওপারে দাদার বিছানা।

আমার অন্য পাশে ছিল পর পর লম্বা সারিতে মাদুর আর চাটাই পেতে কয়েক জন মুসলমান। সকলেই কৃষক শ্রেণীর লোক। আমার সঙ্গে আলাপ করতে বোধ হয় তাদের সংকোচ হচ্ছিল—আর আমি তাদের ধরন-ধারণ লক্ষ করছিলাম। কখনো কখনো দু এক জনের সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছিল, তার ফলে উভয় পক্ষেই ভদ্রতার হাসি বিনিময় চলছিল। লোকগুলো আধা-বয়সী বা ছোকরা। গরিবানা চালের কাপড়-চোপড়। সঙ্গে কাস্তে, লাঠি, বাঁশের চোঙে তেল। আমিই এদের ডেকে আলাপ করলাম। ময়মনসিংহ আর কুমিল্লায় বাড়ি, 'গিরস্তির কাম' অর্থাৎ চাষবাস করতে যাচ্ছে বর্মায়। কলকাতা গিয়ে বর্মার জাহাজ ধরবে। এদের মধ্যে বই নিয়ে যাচ্ছে কয়েক জন—বাংলা কেতাব খান দুই—'জঙ্গনামা' আর 'হাতেম তাই-এর কিসসা'।

সন্ধ্যা হয়, তারা নামাজ পড়বে বলে নিজেদের বিছানা গুটিয়ে পশ্চিম-মুখ হয়ে সারি দিয়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করতে লাগল। জনা তিনেক লোকের সারি, তবু জায়গা হয় না, আমার বিছানায় এসে পড়ে, তাই তারা ইতস্তত করছিল, কী করবে। আমি ব্যাপারটা বুঝে আমার বিছানা গুটিয়ে নিয়ে তাদের জায়গা করে দিলাম। উঠে গিয়ে ওদের নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার দাদার বিছানায় বসলাম। দেখলাম, যারা আমার বিছানার জায়গায় স্থান পেল, তাদের এক জন পাকা দাড়িওয়ালা অত্যন্ত ভদ্র চেহারার বৃদ্ধ মুসলমান আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে মাথা নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নামাজে মন দিলেন।

তাদের নামাজ পড়া শেষ হলে যে যার বিছানাপত্র ঠিক করতে গেল, আমিও যথাস্থানে আমার বিছানা পেতে নিয়ে বসলাম। সেই বৃদ্ধ মুসলমানটি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে বসতে বললাম।

ময়মনসিংহের বাংলায় তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। নামাজ পড়বার সময় জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিনি ধন্যবাদ দিতে এসেছেন। বললেন—বাবু, আমাদের নামাজের সময় আপনি ভালো-মানুষি করে আমাদের জায়গা ছেড়ে দিলেন, আপনি নেকবান্দা, আল্লাহ্ আপনার ভালো করবেন। এই নামাজের যে সওয়াব আমাদের হল, আপনিও তার শরিক হলেন—আল্লাহ্‌র দরবারে আপনার ভালাইয়ের জন্য আমরা দোয়া করি।

সওয়াব—অর্থাৎ পুণ্য। শব্দটির মানে জানতুম, বৃদ্ধের হৃদ্যতা আর উদার ভাব, তাই বুঝতে দেরি হল না। আমার বড় ভালো লাগল। আমি বললাম, মিয়া সাহেব, আপনাকে দেখে আর আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আশরাফ লোক আপনি। কিন্তু মুসলমান হয়ে এক জন অমুসলমানকে কেন আপনাদের ইবাদতের শরিক করছেন ?

উত্তরে তিনি বললেন—বাবু, আশরাফ আতরাফ জানি না, গিরস্ত মানুষ আমরা; যা ভালো তা আল্লাহ্‌র চোখেও ভালো। ভালো কাম দেখলে তিনি কাফের-মুসলমান ফারাক করেন না—আমি দেখে আসছি আপনার আদব নেক। আপনাকে বলতে হল না, আমাদের নামাজের অসুবিধা দেখে আপনি নিজেই উঠে বিছানা সরিয়ে আমাদের জায়গা করে দিলেন—এমন জিনিস আল্লাহ্‌র নজর এড়ায় না। এজন্য আপনার নামে সওয়াব লেখা হয়ে গেল। এ সওয়াব হবে আমাদের নামাজের সওয়াবের হিস্‌সা। আর আমরা মুসলমান, আপনি ভালো করলেন, যদি আমরা তার জন্য শোকর না করি, তা হলে গুনাহ্‌গার হব।

এক জন অশিক্ষিত চাষি শ্রেণীর মানুষের কাছে এ ধরনের উচ্চ সৌজন্যপূর্ণ আদবের কথা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল। বুঝলাম, লোকটি সহজাত সৌজন্যের অধিকারী, যিনি দেখে শুনে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে একটা বিচারের শক্তি অর্জন করেছেন। এরকম মনোভাবের প্রতিষ্ঠা যে কত উঁচু ধরনের সভ্য চিন্তার ওপরে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পদ্মার বুকে চলন্ত জাহাজের ওপরে এই যে ছোট ঘটনাটি সেদিন ঘটেছিল, সেটির ছবি চোখের সামনে এখনো ভাসছে। এই বৃদ্ধ নামাজি কৃষাণের মনোভাবের কথা এখনও মনে গাঁথা আছে। তাঁর কথাগুলো এখনও যেন কানে বাজে। আজকের দিনে এ জিনিস যে মানুষের মধ্যে একান্ত দুর্লভ! বরং সর্বত্র এর উল্টোটাই দেখা যায়। কেন এরকম ইনসানিয়াত ও মহান মনোভাব মানুষের মধ্যে জাগে না, তা-ই ভাবি। এ জিনিস ফিরিয়ে আনবার কোনো পথ কি আমরা পাব না ? যা ভালো, তা এক বার চলে গেলে আর কি ফেরে না ?

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

ইনসানিয়াত — মানবতা, মনুষ্যত্ব।

ডেক — জাহাজের পাটাতন।

আবির — ফাগ, লাল রঙের গুঁড়ো।

কেবিন — জাহাজের কামরা।

'জঙ্গনামা' — 'জং' বা 'জঙ্গ' মানে যুদ্ধ। 'জঙ্গনামা' মানে যুদ্ধকাহিনী। কারবালার যুদ্ধের করুণ কাহিনী নিয়ে লেখা একটি পুঁথির নাম।

'হাতেম তাই-এর কিসসা'—হাতেম তাই-এর কাহিনীবিষয়ক একটি পুঁথি।

নেকবান্দা — পুণ্যবান ব্যক্তি।

শরিক — অংশীদার, অংশভাগী।

হৃদ্যতা — আন্তরিকতা।

আশরাফ — উচ্চ বংশ।

আতরাফ — নিম্ন বংশ।

ইবাদত — আল্লাহ্‌র আরাধনা।
আদব — আচরণ, ব্যবহার।
ইনসাফ — সুবিচার।
নেক — ভদ্র, সৎ।
সওয়াব — পুণ্য।
শোকর না করি — ধন্যবাদ না দিই, কৃতজ্ঞতা না জানাই।
গুনাহ্‌গার — পাপী।
সৌজন্যপূর্ণ — ভদ্রতাযুক্ত।
হিস্‌সা — অংশ, ভাগ।

পাঠ–পরিচিতি

'ইনসানিয়াত' রচনাটিতে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মনুষ্যত্ব ও জীবনাদর্শের মূল দিকটি উপস্থাপন করেছেন।

লেখক এক বার পদ্মানদী দিয়ে স্টিমারে চড়ে যাচ্ছিলেন। ডেকের ওপরে কেবিনের ধার ঘেঁষে এক পাশে তিনি বিছানা পেতেছিলেন। তাঁর অন্য পাশে মাদুর আর চাটাই পেতে বসার ব্যবস্থা করেছিলেন কয়েক জন গরিব মুসলমান যাত্রী। তাঁরা যাচ্ছিলেন বর্মায় চাষবাসের কাজের আশায়।

সন্ধ্যা হলে তাঁরা যখন নামাজের জন্য সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়াতে গেলেন, তখন দেখা গেল তাঁদের স্থানসংকুলান হচ্ছে না। তা দেখে লেখক নিজের বিছানা গুটিয়ে তাঁদের নামাজের জায়গা করে দিলেন। সেই নামাজিদের মধ্যে ছিলেন বেশ ভদ্র চেহারার এক জন বৃদ্ধ। তিনি নামাজশেষে নামাজের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে বললেন, লেখক যে তাঁদের নামাজের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন, তাতে এক জন নেক বান্দা হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁদের ইবাদতের শরিক হয়েছেন ; এজন্য তিনি সওয়াবের ভাগীদার হবেন। লেখক জানতে চাইলেন, অমুসলমান হয়েও কীভাবে তিনি ইবাদতের শরিক হলেন ?

ভদ্রলোক উত্তরে জানালেন, আল্লাহ্‌ যে–কোনো ভালো কাজে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য করেন না। এটাই আল্লাহ্‌র সুবিচারের ধরন। তিনি যে বিছানা সরিয়ে নিজে উঠে গিয়ে নামাজের জন্য জায়গা করে দিয়েছেন, এতে করে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াব লেখা হয়ে গেছে। আর এ ভালো কাজের জন্য যদি শোকর করা না হয়, তা হলে নামাজিরাও গুনাহ্‌গার হবেন।

অশিক্ষিত এক জন চাষির কাছে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত সৌজন্যবোধের পরিচয় পেয়ে লেখক অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মানুষটি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভালো–মন্দ, ন্যায়–অন্যায় সম্পর্কে বিচারের শক্তি অর্জন করেছেন। এটাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা ইনসানিয়াত।

পদ্মার ওপর স্টিমারের ঐ ঘটনার ছবি বহু বছর ধরে লেখকের মন জুড়ে রয়েছে। সেদিন ঐ বৃদ্ধ কৃষাণের মধ্যে যে–মনোভাবের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, বর্তমানকালে মানুষের মধ্যে এই বোধ নেই বললেই চলে।

ঐ মনোভাব ফিরিয়ে আনার আকুল প্রত্যাশায় রচনাটির সমাপ্তি ঘটেছে।

লেখক–পরিচিতি

বহুভাষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত। ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে আমৃত্যু তিনি ছিলেন জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত। তিনি ১৮৯০ সালের ২৬শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে অর্ধশতেরও বেশি বই লিখেছেন। বহু গ্রন্থ তিনি সম্পাদনাও করেছেন। এ ছাড়া অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। বাংলা ভাষায় ইতিহাস ও ব্যাকরণ রচনা তাঁর অসামান্য কীর্তি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : Origin & Development of Bengali Language (ODBL), বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ও ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ। ১৯৭৭ সালের ২৯শে মে তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গল্পের লোকগুলো বর্মায় যাচ্ছিল কেন?

ক. ভ্রমণ করতে খ. চাষাবাদ করতে
গ. জীবিকার সন্ধানে ঘ. কাঠ কাটতে

২. বর্মার যাত্রীরা সাথে কিছু বই নিয়ে যাচ্ছিল। এ বইগুলো

i. উপন্যাস ii. নাটক
iii. পুঁথিসাহিত্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. iii ঘ. i ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩–৫নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এই বৃদ্ধ নামাজি কৃষাণের মনোভাবের কথা এখনও মনে গাঁথা আছে। তাঁর কথাগুলো এখনও যেন কানে বাজে। আজকের দিনে এ জিনিস যে মানুষের মধ্যে একান্ত দুর্লভ! বরং সর্বত্র এর উল্টোই দেখা যায়। কেন এরকম ইনসানিয়াত ও মহান মনোভাব মানুষের মধ্যে জাগে না, তা–ই ভাবি।

৩. বৃদ্ধ নামাজি কৃষাণের মনোভাবে কিসের পরিচয় ছিল?

ক. মানবতার খ. গ্রাম্যতার
গ. সরলতার ঘ. শালীনতার

৪. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের—

ক. ক্ষোভ খ. হতাশা
গ. অভিযোগ ঘ. আক্ষেপ

৫. ইনসানিয়াতের অর্থ

i. মনুষ্যত্ব ii. ভদ্র
iii. মহত্ত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এমন জিনিস আল্লাহ্র নজর এড়ায় না। এজন্য আপনার নামে সওয়াব লেখা হয়ে গেল। এ সওয়াব হবে আমাদের নামাজের সওয়াবের হিস্‌সা। আর আমরা মুসলমান, আপনি ভালো করলেন, যদি আমরা তার জন্য শোকর না করি, তাহলে গুনাহ্গার হব।

ক. কেমন জিনিস আল্লাহ্র নজর এড়ায় না? খ. 'সওয়াবের হিস্‌সা' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
গ. শোকর করার মাধ্যমে কী লাভ করা যায়—যৌক্তিক উপস্থাপন কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে একজন প্রকৃত মুসলমান–এর বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একজন অশিক্ষিত চাষি শ্রেণীর মানুষের কাছে এ ধরনের উচ্চ সৌজন্যপূর্ণ আদবের কথা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল। বুঝলাম, লোকটি সহজাত সৌজন্যের অধিকারী, যিনি দেখে শুনে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভালো–মন্দ, ন্যায়–অন্যায় সম্বন্ধে একটা বিচারের শক্তি অর্জন করেছেন। এরকম মনোভাবের প্রতিষ্ঠা যে কত উঁচু ধরনের সভ্য চিন্তার ওপরে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক. উদ্ধৃতাংশের বক্তা কে? খ. সহজাত–সৌজন্য বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্ধৃতাংশে সাধারণ মানুষের সৌজন্যবোধের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা বর্তমান সমাজে কতটা পরিলক্ষিত হয়?
ঘ. একজন অশিক্ষিত চাষির প্রতি লেখকের যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তার যৌক্তিক মূল্যায়ন কর।

লাইব্রেরি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী



পুস্তকের শ্রেণীবদ্ধ সংগ্রহকে লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার বলা হয়। সর্বপ্রকার জ্ঞানকে একত্র করে স্থায়িত্বদানের অভিপ্রায় থেকে লাইব্রেরির সৃষ্টি। এক ব্যক্তির পক্ষে সর্ব বিদ্যাবিশারদ হওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। আবার যে ব্যক্তি যে বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে, তার সবটুকু জ্ঞান মস্তিষ্কে ধারণ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন এমন কোনো উপায় উদ্ভাবনের, যার দৌলতে দরকার অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ের একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা যায়। ফলে লাইব্রেরির সৃষ্টি।

লাইব্রেরি তিন প্রকার। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাধারণ। ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ব্যক্তিমনের খেয়ালমতো গড়ে ওঠে— তা হয়ে থাকে ব্যক্তির মনের প্রতিবিম্ব। ব্যক্তি যে ধরনের রচনা ভালোবাসে তার প্রাচুর্য, আর যে ধরনের রচনা পছন্দ করে না তার অনুপস্থিতি হয়ে থাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বৈশিষ্ট্য। এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, খেয়ালমতো গড়ে তোলে তার কল্পনার তাজমহল। কাব্যপ্রেমিক হলে কাব্যগ্রন্থ দিয়ে, কথাসাহিত্যপ্রেমিক হলে কথাসাহিত্য দিয়ে, ইতিহাসপ্রিয় হলে ঐতিহাসিক গ্রন্থ দিয়ে সে সাজিয়ে তোলে তার টেবিল, আলমারির শেলফ—সব কিছু । কারো বাধা দেওয়ার অধিকার নেই, আপত্তি করবার দাবি নেই, উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে সে স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরি যেমন ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিবিম্ব, পারিবারিক লাইব্রেরি তেমনি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতিচ্ছায়া। এখানে যেমন একের রুচির ওপর বহুর অত্যাচার অশোভন, তেমনি বহুর রুচির ওপর একের জবরদস্তি অন্যায়। দশ জনের রুচির দিকে নজর রেখেই পারিবারিক লাইব্রেরি সাজাতে হয়।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরি ব্যক্তি বা পরিবারের মর্জিমাফিক গড়ে ওঠে। সাধারণের হুকুম চালাবার মতো সেখানে

কিছুই নেই। লাইব্রেরিসম্পন্ন ব্যক্তির চালচলনে এমন একটা শ্রী ফুটে উঠতে বাধ্য, যা অন্যত্র প্রত্যক্ষ করা দুষ্কর। সত্যিকার বৈদগ্ধ্য বা চিৎপ্রকর্ষের অধিকারী হতে হলে লাইব্রেরির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তা ছাড়া, লাইব্রেরি বা শ্রেণীবদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ গৃহসজ্জার কাজেও লাগে। আর এই ধরনের গৃহসজ্জায় লাভ এই যে, বাইরের পারিপাট্যের সঙ্গে তা মানসিক সৌন্দর্যেরও পরিচয় দেয়। লাইব্রেরি সৃজনে তৎপর হয়ে ধনী ব্যক্তিরা পুস্তক কেনার নেশা সৃষ্টি করলে দেশের পক্ষে লাভ হবে এই যে—অনবরত বাঁধানো পুস্তকগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে তাদের চামড়ার তলে যে একটি মন সুপ্ত রয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠবেন। লাইব্রেরি সৃজনের দরুন তাঁরা নিজেরা ততটা লাভবান না হলেও তাঁদের পুত্র-কন্যাদের যথেষ্ট উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। হয়তো এই লাইব্রেরি থাকার দরুনই পরিণত বয়সে তারা সুসাহিত্যিক বা সাহিত্য-সমঝদার হয়ে উঠবে। এ আশা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, বড় বড় সাহিত্যিক বা কবিদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, বাল্যে তাঁরা পিতার অথবা পারিবারিক লাইব্রেরি থেকে সাহিত্যসাধনার প্রেরণা লাভ করেছেন।

সাধারণ পাঠাগার আধুনিক জিনিস। কারণ, ঐতিহাসিকরা কী বলবেন জানি নে, যে জ্ঞানার্জন স্পৃহা থেকে পাঠাগারের জন্ম, ব্যাপকভাবে তার জাগরণস্পৃহা সহজে মেটানো সম্ভব নয়। জ্ঞানের বাহন পুস্তক, আর পুস্তক কিনে পড়া যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা ধারণা করা সহজ। পুস্তকের ব্যাপারেও সমবায়নীতির আবশ্যক। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও দশে মিলে কাজ না করলে সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব। এ ব্যাপারে দশের মিলিত ফলস্বরূপ যা পাওয়া যায়, তাকেই সাধারণ লাইব্রেরি বলা হয়। অবশ্য সাধারণ লাইব্রেরি ব্যক্তির দানও হতে পারে। তবে ব্যক্তিগত প্রভাবের চাইতে সাধারণের প্রভাবই সেখানে বলবত্তর হতে বাধ্য। যদি না হয়, তবে সাধারণ পাঠাগার না বলে ব্যক্তিগত পাঠাগার বলাই ভালো।

সাধারণ লাইব্রেরির পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিতে হলেও পুস্তক নির্বাচনে বিশেষ সাবধানতার পরিচয় দিতে হয় বলে মনে হয় না।

সাধারণ লাইব্রেরির পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে আরেকটি কথা বলা দরকার। পুস্তক নির্বাচনকালে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা জাতীয় সংকীর্ণতার পরিচয় যত কম দেওয়া হয়, ততই ভালো। কারণ, যত দূর মনে হয়, পাঠাগার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রক্ষক নয়, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশক। আর ভালো পুস্তক-লেখক যখন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন, সমস্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়, তখন পুস্তক নির্বাচনকালে সংকীর্ণ মনোভাবসম্পন্ন না হওয়াই ভালো।

জাতীয় জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতো দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থ প্রসার, আরেক ধারার নাম আত্মপ্রকাশ বা পরমার্থ বৃদ্ধি। এক দিকে যুদ্ধবিগ্রহ, মামলা-ফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য দিক, অপর দিকে সাহিত্য-শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। এক দিকে শুধু কাজের জন্য কাজ, অপর দিকে আনন্দের জন্য কাজ। এক দিকে সংগ্রহ, আরেক দিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিকটির প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সে জাতি কখনও উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না। কোনো প্রকারে টিকে থাকতে পারলেও নব নব বৈভব সৃষ্টি তার দ্বারা সম্ভব হয় না। মানসিক ও আত্মিক জীবনের সাধনা থেকে চরিত্রে যে শ্রী ফুটে ওঠে, তা থেকে তাকে এক রকম বঞ্চিত থাকতেই হয়। জীবনে শ্রী ফোটাতে হলে দ্বিতীয় দিকটির সাধনা আবশ্যক। আর সেজন্য লাইব্রেরি এক অমূল্য অবদান।

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড। কারণ, বুদ্ধির জাগরণ ভিন্ন জাতীয় আন্দোলন হুজুগপ্রিয়তা ও ভাববিলাসিতার নামান্তর, আর পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত বুদ্ধির জাগরণ অসম্ভব।

লাইব্রেরির শ্রেষ্ঠতা এইখানে যে, তা আমাদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা না করতে পারলেও সভ্যতার আদর্শটি অক্ষুণ্ন রেখে আমাদের আলোকাভিসারী করে তুলতে পারে।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

অভিপ্রায় — ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা।

সর্ববিদ্যাবিশারদ — সব বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

পারদর্শিতা — নৈপুণ্য, পটুতা।

উদ্ভাবন — আবিষ্কার, গবেষণা করে নতুন কিছু বের করা।

প্রতিবিম্ব — প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিফলিত অবিকল রূপ।

স্বেচ্ছাচারী — যে আপন ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে।

স্বেচ্ছাচারী সম্রাট — যে–রাজা আপন ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করেন। এখানে ব্যাক্যাংশটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে—ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বই সংগ্রহকারী।

খেয়ালমতো গড়ে তোলে কল্পনার তাজমহল — সম্রাট শাহ্জাহান যেমন করে তাজমহল তৈরি করে শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব রুচি ও শিল্পীমনের নিদর্শন।

কাব্যপ্রেমিক — যে কবিতা ভালবাসে।

প্রতিচ্ছায়া — প্রতিফলন, প্রতিচ্ছবি।

অশোভন — যা শোভন বা সুন্দর নয়।

জবরদস্তি — জুলুম, পীড়ন, বাড়াবাড়ি।

মর্জিমাফিক — ইচ্ছা অনুযায়ী, খেয়াল অনুসারে।

শ্রী — সৌন্দর্য।

দুষ্কর — দুঃসাধ্য, যা সহজে করা যায় না।

বৈদগ্ধ্য — পাণ্ডিত্য।

চিত্তপ্রকর্ষ — জ্ঞানচর্চার ফলে মনের উন্নতি।

পারিপাট্য — শৃঙ্খলা, গোছানো ভাব।

সৃজন — সৃষ্টি।

সমবায় নীতি — বহু মানুষের সমবায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্বেচ্ছামূলক উদ্যোগে দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের নীতি।

সমঝদার — বোঝে এমন, রসজ্ঞ।

স্পৃহা — ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা।

বলবত্তর — অধিকতর শক্তিশালী।

শ্রেণীবন্ধ — শ্রেণী বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সারি সারি সাজানো।

সম্প্রদায় — বিশেষ সমাজ বা গোষ্ঠী।

বিকাশক — যা বিকাশ ঘটায়।

সাধারণ পাঠাগার আধুনিক জিনিস — আধুনিক কালের আগেও সাধারণ পাঠাগার ছিল। তবে সমবায় পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা সাধারণ পাঠাগার বেশি ছিল না।

পাঠ-পরিচিতি

মানবসভ্যতার ক্রম অগ্রগতির ধারায় মানুষের অর্জিত জ্ঞান, মহৎ অনুভব সঞ্চিত হয়ে থাকে গ্রন্থাগারে। এর মাধ্যমে পূর্বপুরুষের জ্ঞান সঞ্চারিত হয় উত্তরপুরুষের কাছে। তাই জ্ঞানচর্চা, অন্বেষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ্রন্থাগার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বইয়ের শ্রেণীবন্ধ সংগ্রহশালা। সব ধরনের জ্ঞানের একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে জ্ঞানচর্চার প্রসারে ধারাবাহিক ও স্থায়ী ভূমিকা পালনের জন্য লাইব্রেরির সৃষ্টি। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার এত বহুমুখী ও বিপুল যে, কোনো এক জনের পক্ষে সব জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। তাই এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী জ্ঞানচর্চা করতে পারেন।

গ্রন্থাগার তিন ধরনের। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাধারণ।

ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে ব্যক্তির রুচি ও আগ্রহমাফিক সংগৃহীত বই দিয়ে। পক্ষান্তরে, পারিবারিক গ্রন্থাগারে পরিবারের সদস্যদের সবার রুচি ও চাহিদার প্রতিফলন ঘটে।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরি থেকে ব্যক্তি নিজে, তার পরিবারের সদস্যরা এবং উত্তরাধিকারীরা উপকৃত হয়। অনেক বড় বড় সাহিত্যিক রয়েছেন যাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লাইব্রেরি থেকে সাহিত্যসাধনার উপকরণ ও প্রেরণা পেয়েছেন।

সাধারণ পাঠাগার অনেকটা হাল আমলের সৃষ্টি। যাদের পক্ষে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরি করা সম্ভব হয় না, তাদের ও সাধারণ জনগণের জ্ঞানস্পৃহা মেটানোর জন্য এ ধরনের পাঠাগারের সৃষ্টি। বই জ্ঞানের বাহন হলেও এক জনের পক্ষে সব বই কেনা সম্ভব নয়। ফলে সাধারণ পাঠাগার থাকলে তিনি উপকৃত হন। কোনো কোনো সাধারণ পাঠাগার হয়তো ব্যক্তিগত দানের ফলেই গড়ে ওঠে। কিন্তু সেখানে দাতার ভূমিকা মুখ্য হয় না, সাধারণের ভূমিকা ও স্বার্থ সেখানে প্রাধান্য পায়। সাধারণ পাঠাগারের বই নির্বাচনের বেলায় উদার দৃষ্টিভঙ্গি দরকার, যেন তাতে সকল সম্প্রদায়ের সকল বয়সের লোক উপকৃত হতে পারে।

সাধারণত জাতীয় জীবনের অগ্রগতি দুটি ধারায় হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ও স্বার্থরক্ষার দিক, অন্যটি হচ্ছে সাহিত্য শিল্প সৃষ্টি ও মননচর্চার দিক। যে জাতি কেবল প্রথম ধারাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সে জাতি উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না। তাই উন্নত জাতি গঠনে মানসিক ও আত্মিক সাধনা অপরিহার্য। আর সে ক্ষেত্রে লাইব্রেরির ভূমিকা ও অবদান অসামান্য। গ্রন্থাগার তাই জাতীয় বিকাশ ও উন্নতির মানদণ্ড। গ্রন্থাগার ব্যবহার ও বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া জাতীয় চেতনার জাগরণ হয় না।

তাই সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ‘লাইব্রেরি’ বা গ্রন্থাগার অপরিহার্য।

লেখক-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বাংলা ভাষার এক জন মননশীল গদ্যলেখক। কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও চিন্তা-উদ্দীপক ও পরিচ্ছন্ন গদ্যরচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তিনি একটি নির্দিষ্ট আসন করে নিয়েছেন। তিনি ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ছিলেন এক উদারহৃদয়, রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান মানবপ্রেমিক। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ ‘সংস্কৃতি কথা’য় রয়েছে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষার কথা। তাঁর দুটি অনুবাদগ্রন্থ হল ‘সুখ’ ও ‘সভ্যতা’।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর ৫৩ বছর বয়সে পরলোকগমনের আগে তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পুস্তকের শ্রেণীবন্ধ সংগ্রহকে কী বলে?

ক. পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র
খ. পুস্তক প্রকাশনী
গ. পড়ার ঘর
ঘ. লাইব্রেরি

২. বই পড়ার অভ্যাস জাতির কী উপকার করে?

ক. জাতীয় চেতনার জাগরণ ঘটে
খ. জাতির প্রত্যেকটি মানুষ রুচিশীল হয়
গ. ভালো লেখক সৃষ্টি হয়
ঘ. সকলেই সাহিত্যচর্চা করতে পারে।

৩. জীবনে শ্রী ফোটাতে হলে প্রয়োজন—

i. শিল্প–সাহিত্যের প্রসারতা লাভ
ii. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধন
iii. আত্মিক ও মানসিক উন্নতি সাধন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii
ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ব্যক্তি যে ধরনের রচনা ভালোবাসে তার প্রাচুর্য, আর যে ধরনের রচনা পছন্দ করে না তার অনুপস্থিতি হয়ে থাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বৈশিষ্ট্য। এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, খেয়ালমতো গড়ে তোলে তার কল্পনার তাজমহল। কাব্যপ্রেমিক হলে কাব্যগ্রন্থ দিয়ে, কথাসাহিত্যপ্রেমিক হলে কথাসাহিত্য দিয়ে, ইতিহাসপ্রিয় হলে ঐতিহাসিক গ্রন্থ দিয়ে সে সাজিয়ে তোলে তার টেবিল, আলমারির শেলফ–সব কিছু। কারো বাধা দেওয়ার অধিকার নেই, আপত্তি করবার দাবি নেই, উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে সে স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

ক. লাইব্রেরি কত প্রকার?
খ. "এখানে ব্যক্তি 'স্বেচ্ছাচারী সম্রাট' খেয়ালমতো গড়ে তোলে তার কল্পনার তাজমহল।"—কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
গ. তোমার লাইব্রেরি তুমি কীভাবে সাজাতে চাও লেখ।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরির ভালো ও খারাপ দিকের একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

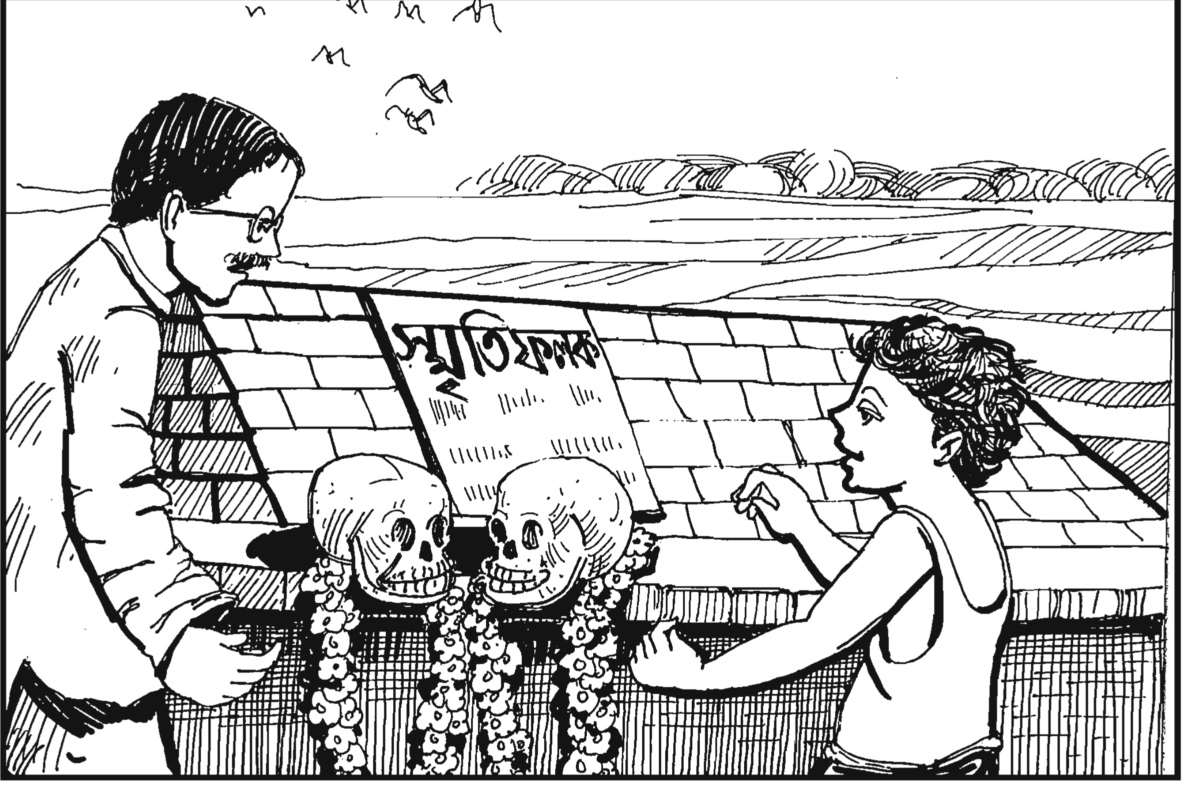
২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

পারিবারিক লাইব্রেরি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতিচ্ছায়া। আর সাধারণ পাঠাগারে সর্বসাধারণের রুচির মূল্য দেওয়া হয়। লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড। কারণ বুদ্ধির জাগরণ ভিন্ন জাতীয় আন্দোলন হুজুগপ্রিয়তা ও ভাববিলাসিতার নামান্তর, আর পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত বুদ্ধির জাগরণ অসম্ভব।

ক. সাধারণ জনগণের জ্ঞানস্পৃহা মেটানোর জন্য কোন লাইব্রেরির প্রয়োজন?
খ. 'পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত বুদ্ধির জাগরণ অসম্ভব' কথাটি বুঝিয়ে বল।
গ. তোমার পরিবারে একটি সুন্দর লাইব্রেরি কীভাবে গড়ে তোলা যায় আলোচনা কর।
ঘ. 'লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড'–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

মাল্যদান

রণেশ দাশগুপ্ত



একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের জয়ের পর ঘরে ফিরে এল ঘরছাড়া মানুষ। দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল এক কোটি লোক। আর দেশের ভিতরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছিল আরও এক কোটি। এবার সবার নিজের নিজের ঘরে ফেরার পালা। যারা ফিরে এল তারা দেখল, যাদের রেখে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকে নেই।

হিংস্র পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও স্থানীয় আলবদর রাজাকাররা গ্রামের পর গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা সমেত অসংখ্য নর–নারী–শিশুকে নদীর ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা চরগুলোর বিরান এলাকায় জড়ো করে খুন করেছিল। প্রায় প্রত্যেকটা মহকুমায় কয়েকটা করে বধ্যভূমি তৈরি হয়েছিল।

স্বাধীনতার ঠিক পরেই এই বধ্যভূমিগুলোতে নিখোঁজদের চিহ্নের খোঁজ করা হল। পরে এই বধ্যভূমিগুলো হল শহীদভূমি।

যে ঘটনাটার কথা এখানে বলছি, সেটা এই রকমের একটা বধ্যভূমি নিয়ে। স্বাধীনতার পরের বছরের ঘটনা। ঝালকাঠিতে একটা ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে গেলেন ঢাকা থেকে অধ্যাপক কামাল। প্রধান অতিথি হিসেবে। স্টিমারে লম্বা পথ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অধ্যাপক কামাল স্টেনগান কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং ছিলেন ধলেশ্বরীর ধার ঘেঁষে এক গণ্ডগ্রামে। মাঝে মাঝে লঞ্চ নিয়ে দখলদার বাহিনীর লোকেরা গঞ্জে গঞ্জে হানা দিত। তাদের সঙ্গে দু-একটা খণ্ডযুদ্ধ করেছিলেন তিনি। কলেজ ও স্কুলের কয়েকটি ছেলেকে দখলদার বাহিনীর লঞ্চের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝোঁক থেকে

ঠেকিয়ে রাখতে হয়েছে তাঁকে। এক ঝাঁক ছেলে মুক্তিযোদ্ধাদের এই ছোট দলটিকে সাহায্য করত। দরকার হলে নৌকা বাইত। এদের সবাইকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন গ্রাম এলাকায় একটা সংসারের মতো পেতেছিলেন তিনি। নতুন সমাজ গঠন নিয়ে আলোচনা করতেন। বই পড়াতেন।

ঝালকাঠি যাওয়ার সময় স্টিমারের ডেকে লম্বা নদীপথে দাঁড়িয়ে দূর–দূরান্তরের দৃশ্য দেখছিলেন অধ্যাপক কামাল। গাছপালায় ঢাকা অসংখ্য গ্রামকে দেখে কল্পনার চোখে তাঁর মনে হচ্ছিল, মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গানটা খুব দীর্ঘ। ধলেশ্বরীর কিনারা থেকে এতটা বুঝতে পারা যায়নি। এবার ফিরে গিয়ে রণাঙ্গানের বিস্তৃতির ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যাবে গ্রামের সবাইকে। এমনকি ঢাকাতেও বলা যাবে। ছেলেমেয়েরা কোথায় কি করেছে তার একটা হিসাব পেশ করা যাবে।

ঝালকাঠি সন্ধ্যা নদীর ধারে একটা বন্দর। এখানে একটা কলেজ আছে। খুলনা আর বরিশালের যোগসূত্র এখানে। ছাত্র আন্দোলনের নাম আছে। নদীর ধারের কলেজে নদীর কোলে আশৈশব লালিত ছেলেদের গুঞ্জনে ঝড়ো ঢেউ ওঠে। উর্মিলতাও রয়েছে। হাজার খানেক তরুণতরুণীর সঙ্গো সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন অধ্যাপক কামাল।

গভীর রাতে জেটিতে স্টিমার ঠেকলে সিঁড়ি লাগানোর পরে ছাত্ররা তাঁকে প্রায় শূন্যে তুলে নামালো। তাদের ধারণা, ঢাকার অধ্যাপক আর বুদ্ধিজীবীরা ঝালকাঠিকে গেঁয়ো মনে করে। স্টিমারটার ব্যবহারও অনেকটা নৌকার মতো। ওঠানামা করার সমস্ত দায়িত্ব যাত্রীদের।

সুতরাং সেই রাতে অধ্যাপক কামাল ঝালকাঠির আর কিছু দেখতে পেলেন না।

সকাল আটটায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হল তাঁকে। একটি ছোট বক্তৃতা করলেন। এরপরে ছাত্রছাত্রীরা সবাই লাইন করে দাঁড়াল। অধ্যাপক কামালকে লাইনের মাথায় গিয়ে দাঁড়াতে হল।

একটি ছেলে বিনীতভাবে বলল, 'স্যার, এখন আমরা বধ্যভূমিতে যাব। সেখানে একটি স্মৃতিফলক আছে। তাতে আপনি মালা দেবেন।' মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী লঞ্চ থেকে নেমে বন্দরে হানা দিত। যাকে সামনে পেত পুরুষ, মেয়ে ও শিশু নির্বিশেষে ধরে নিয়ে এই বধ্যভূমিতে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারত। বিজয়ের পর কঙ্কাল আর খুলির মধ্যে পাগলের মতো বন্দরের মানুষ তাদের আপনজনকে খুঁজেছে। নিয়েও গিয়েছে অনেকে আন্দাজ করে মাথার খুলি! আজ একেবারে পরিষ্কার।

ঝালকাঠি বন্দরটাকে প্রায় সর্বাংশে পেরিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটে অধ্যাপক কামাল গিয়ে পৌছলেন বধ্যভূমিতে। দেখলেন সন্ধ্যা নদীর ধারে একটা চর। হু–হু হাওয়া। এরই ধার ঘেঁষে ইট দিয়ে বাঁধানো উঁচু বেদি। বেদির ওপর শ্বেতপাথরের ফলক। তাতে শহীদদের উদ্দেশে একটা লেখন। সংক্ষিপ্ত লেখা, কিন্তু তীক্ষ্ণ।

অধ্যাপক কামালকে এই উঁচু ছিমছাম বেদিটির পাঁশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হল। খানিকটা দূরে দীর্ঘ মিছিল দাঁড়িয়ে রয়েছে। অধ্যাপক কামাল ধলেশ্বরীর ধারের বাসিন্দা ও মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বললেন। বললেন, ঝালকাঠির বাসিন্দা ও মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। বধ্যভূমির ওপর দিয়ে তখন বয়ে চলেছে উদ্দাম বাতাস। অধ্যাপক কামালের কথাগুলোকে সেই বাতাস যেন লুফে লুফে নিয়ে যাচ্ছিল।

এরপরেই মালা দেবার পালা। অধ্যাপক কামাল দুটি মালা দুই হাতে উঁচুতে তুলে সমবেত জনতাকে দেখালেন। তারপর মালা দুটি স্তৃতিফলকের ওপর রাখলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এসে এক ঝটকায় মালা দুটিকে ফেলে দিল। আবার সন্তর্পণে রাখতে গেলেন। আবারও ব্যর্থ হলেন। মালা দুটিকে স্মৃতিফলকের কোথাও গোঁজার উপায় ছিল না।

অধ্যাপক কামাল দুটো ইট আনতে বললেন, মালা দুটিকে চাপা দিতে। সেই শূন্য প্রান্তরের মতো বধ্যভূমির চরের জোর হাওয়ায় ভারি জিনিস না হলে মালা রাখা যাবে না, একথা জানালেন। একটি ছেলে চরের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে করতে হঠাৎ এসে দাঁড়াল অধ্যাপকের সামনে। তার হাত দুটি পেছন দিকে।

– স্যার।

– বল।

– পেয়েছি চাপা দেবার জিনিস। কিন্তু এগুলো যে মাথার খুলি।

অধ্যাপকের বিস্মিত চোখের সামনে তুলে ধরল সে মাথার খুলি দুটি। নিজেকে সামলে নিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'আশ্চর্য! যাদের মালা দেওয়া হচ্ছে তাদেরই হয়ে দুজন কি তোমার হাতে উঠে এসেছে! কিন্তু এদের নিশ্চয়ই নাম ছিল। কী নাম? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি খুলি দুটো তুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'এদের একজনের নাম যেন পারুল, আরেকজনের নাম সিতারা। পারুল আর সিতারার জন্য রইল মালা।'

তারপর অধ্যাপক কামাল ঐ দুটি মাথার খুলি দিয়েই মালা দুটি চাপা দিলেন সেই স্মৃতিফলকের ওপর। মালা দুটিকে দেখে মনে হল, মালা গলায় পারুল আর সিতারা বেদির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপক চলে এলেন মিছিলের মাথায়। কাউকে আর কিছু খুলে বললেন না। বধ্যভূমিতে যাদের প্রাণনাশ করা হয়েছিল, তাদের নিকট–আত্মীয়রা দ্বিধায় পড়বেন এই খুলি নিয়ে। তার চেয়ে বরং সকলের তরফ থেকে মালা দিয়ে তাদের স্মৃতিপটে বাঁচিয়ে রাখা যাক।

শব্দার্থ ও টীকা

আল-বদর – পূর্ণচন্দ্র। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদারদের সহায়ক বিশেষ বাহিনী।

রাজাকার – স্বেচ্ছাসেবক। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদারদের সহায়ক বিশেষ বাহিনী।

হত্যাযজ্ঞ – হত্যার অনুষ্ঠান, একের পর এক নির্মম খুনের ঘটনা।

বধ্যভূমি – যেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়।

গণ্ডগ্রাম – জনবহুল গ্রাম। দূরের গ্রাম অর্থে এখানে ব্যবহৃত।

বিপ্লব – রাষ্ট্র বা সমাজের আমূল পরবর্তন।

আশৈশব – শিশুকাল থেকে।

উর্মিলতা – ঢেউ খেলানো রূপ। উর্মিমুখরতা।

জেটি – জাহাজ ঘাটের প্লাটফরম।

বুদ্ধিজীবী – যাঁরা জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চা করেন।

স্মৃতিফলক – স্মৃতি রক্ষার জন্যে নির্মিত ফলক।

নির্বিশেষে – ভেদাভেদহীন।

বেদি – মঞ্চের মতো উঁচু জায়গা।

ছিমছাম – গোছানো। পরিপাটি।

সন্তর্পণে – খুব সাবধানে। সতর্কতার সঙ্গে।

দ্বিধা – দোটানা। সংশয়।

স্মৃতিপট – স্মৃতির মণিকোঠায়।

পাঠ–পরিচিতি

মুক্তিযুদ্ধে নাম না জানা অগণিত সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের প্রতিফলন ঘটেছে ‘মাল্যদান’ গল্পে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী গ্রামে গ্রামে চালিয়েছিল নির্মম হত্যাযজ্ঞ। তাদের দোসর ছিল আলবদর আর রাজাকাররা। মুক্তি সংগ্রামীদের মনোবল ভেঙে দিতে তখন তৈরি করা হয় অসংখ্য বধ্যভূমি। অগণিত নারী–পুরুষ–শিশুকে হত্যা করা হয় এসব বধ্যভূমিতে। হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের অত্যাচারে দেশছাড়া হয় এক কোটি মানুষ।

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর ঘরছাড়া মানুষ ঘরে ফেরে। তখন নিখোঁজ, নিহত কিংবা গুম হয়ে যাওয়া আত্মীয়–স্বজনের খোঁজ নিতে গিয়ে আবিষ্কৃত হয় অসংখ্য বধ্যভূমি। এসব বধ্যভূমি আসলে এ দেশের লাখো শহীদের স্মৃতি বিজড়িত শহীদভূমি।

ঝালকাঠিতে এক ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে অধ্যাপক কামালকে উপস্থিত হতে হয়েছিল এমন এক শহীদভূমিতে। সেখানে এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন তিনি।

সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে সম্মেলনে আগত সবার সঙ্গে তিনি গেলেন সন্ধ্যা নদীর ধারে একটা চরের বধ্যভূমিতে শহীদ স্মরণে নির্মিত স্মৃতিফলকে ফুল দিতে। একে একে দুটি মালা স্মৃতিফলকে রাখতেই নদীর তীরের খোলা হাওয়ার তোড়ে সেগুলো পড়ে গেল নিচে। মালা দুটি ভারি কিছু দিয়ে চাপা দেওয়ার জন্য ইট খুঁজতে গিয়ে একজন নিয়ে এল দুটি মাথার খুলি। তা দেখে অধ্যাপক বিস্মিত। অনেকটা যেন নাম না–জানা শহীদের পক্ষ থেকে দুজন শহীদ বুঝি মালা নিতে এসেছে। আবেগাপ্লুত অধ্যাপক তাঁদের দুটি কাল্পনিক নাম উচ্চারণ করলেন, যেন সকল

শহীদের প্রতীক হয়ে ওঠে তাঁরা। মাথার খুলি দুটি দিয়ে তিনি মালা দুটি চাপা দিলেন স্মৃতিফলকের ওপর। মনে হল, দুজন শহীদ যেন শ্রদ্ধানিবেদিত সেই মালা গলায় পরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

লেখক–পরিচিতি

রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী। তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অগ্রসেনা। প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের সংগঠক ও নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে তিনি বারবার কারাভোগ করেন। তিনি ছিলেন দৈনিক সংবাদ–এর সাংবাদিক। তিনি 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে', 'উপন্যাসের শিল্পরূপ', 'আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক।

রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম ১৯১২ সালের ১২ই জানুয়ারি। তাঁর পৈত্রিক আবাস লৌহজঙ্গের গাউপাড়া গ্রামে। ১৯৯৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

বাড়তি জানার জন্যে

মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক মহান গৌরবগাথা। স্বাধীনতার জন্যে মরণজয়ী সংগ্রামের নানা ঐতিহাসিক দলিল ও স্মৃতি নির্দশন রয়েছে ঢাকার শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরে। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গাবন্ধু ধানমণ্ডির যে বাড়িটিতে সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন সেটি এখন 'বঙ্গাবন্ধু জাদুঘর' নামে পরিচিত। এ ছাড়া সেগুনবাগিচায় আছে 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'। বিভিন্ন সেনানিবাসেও মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর রয়েছে। কখনও সুযোগ হলে অভিভাবক ও শিক্ষকের সঙ্গো গিয়ে জাদুঘরগুলো দেখে এসো। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনেক তথ্যই তোমরা জানতে পারবে।

বধ্যভূমি সম্পর্কে তথ্য

বাংলাদেশের অনেক জায়গায় বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে। তোমার এলাকায় একাত্তরের কোনো বধ্যভূমি রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ নাও। বধ্যভূমিতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে জানতে চেষ্টা কর। তুমি যেসব তথ্য জানতে পার তা খাতায় লিখে রাখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মালাদুটো স্মৃতিফলকের ওপর রাখার জন্য কী দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল?

ক. ইট
খ. পাথর
গ. খুলি
ঘ. গাছের ডাল।

২. বধ্যভূমিতে–

i. শহীদদের কবর দেওয়া হয়
ii. নারী পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়।
iii. শহীদদের চিহ্নের খোঁজ করা হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অংশ পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অধ্যাপক কামাল নতুন সমাজ গঠন নিয়ে আলোচনা করতেন। বই পড়াতেন।

৩. এ সময় তিনি ছিলেন–

ক. মুক্তিযোদ্ধা
খ. খণ্ডযোদ্ধা
গ. অধ্যাপক
ঘ. প্রধান অতিথি

৪. কামাল সাহেব নতুন সমাজ নিয়ে আলোচনা করতেন, বই পড়াতেন–

i. তিনি অধ্যাপক ছিলেন বলে।
ii. মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা জন্য।
iii. সবাইকে নিয়ে সংসারের মত পেতেছিলেন বলে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সোহান মায়ের সাথে নাটোরে এসেছে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে একটি স্মৃতিফলক উদ্বোধন করতে। তার বাবা ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে নাটোরে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে আরও অনেকের সাথে শহীদ হন। পাক বাহিনী শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের এক বিরান প্রান্তরে গর্ত করে মাটিচাপা দেয়। স্বাধীনতার পর বাবা ফিরে না এলে সোহানের মা অনেক কষ্টে এই বধ্যভূমির কথা জানতে পারেন। অনেক অজ্ঞাতনামা শহীদের সাথে সোহানের বাবার লাশও রয়ে গেছে এই বধ্যভূমিতে। আজ এখানেই স্মৃতিফলক উদ্বোধন করবে সোহান।

ক. অধ্যাপক কামাল কেন ঝালকাঠিতে গিয়েছিলেন?

খ. অধ্যাপক কামাল মালাদুটো স্মৃতিফলকে রাখতে পারছিলেন না কেন?

গ. উদ্বৃতাংশের সাথে তোমার পঠিত 'মাল্যদান' গল্পের মূল সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

ঘ. শহীদদের স্মৃতি রক্ষায় সোহানের স্মৃতিফলক উদ্বোধন ভূমিকা রাখবে–'মাল্যদান' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ইংল্যান্ডের এক জন মনীষী কার্লাইল এক বার একটা কথা বলেছিলেন, 'কেউ যদি হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করেন যে, গোটা ভারত সাম্রাজ্য এবং শেক্সপিয়র এদের যে-কোনো এক জনকে ছেড়ে দিতে হলে আমি কাকে ছাড়ব, তা হলে একটুও ইতস্তত না করে আমি বলব, ভারত সাম্রাজ্য থাক না-থাক, শেক্সপিয়রকে ছেড়ে আমার কিছুতেই চলবে না।'

গোটা উপমহাদেশ মিলিয়ে যে বিরাট সাম্রাজ্য ইংরেজদের ছিল, তার আয়তন বা সম্পদ সামান্য নয়। সেখানকার মাটিতে ছিল মুঠি মুঠি সোনা ছড়ানো। কিন্তু কার্লাইল মনে করেছিলেন—তার চেয়েও বড়, অনেক বেশি দামি হলেন এক জন লোক, যাঁর নাম ছিল শেক্সপিয়র। উইলিয়াম শেক্সপিয়র। তিনি এমন কিছু বিষয়সম্পত্তি রেখে যাননি, তাঁর বংশধরেরাও কেউই বেঁচে নেই; শুধু আছে তাঁর কিছুসংখ্যক বই।

বই তো অনেকেই লেখে। কিন্তু কটা বই টিকে থাকে? সব দেশের সব কালের মানুষের মন জয় করতে পারে, এমন লেখক কজন জন্মেছেন পৃথিবীতে? অল্প যে-কজন জন্মেছেন, শেক্সপিয়র তাঁদের মধ্যে একজন।

এই যে তিনি ছাড়িয়ে এসেছেন তাঁর দেশকে, তাঁর কালকে, এইখানেই শেক্সপিয়রের মহত্ত্ব। এইজন্যই বলা হয়—তিনি কোনো দেশের নন, কোনো বিশেষ কালের নন—তিনি সকল দেশের, সকল কালের। সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় এই মানুষটির জীবন কিন্তু কেটেছে খুবই সাধারণ, সাদামাটাভাবে। নাটক ও কবিতা লেখা ছাড়া তিনি এমন জমকালো কিছু করেননি, যা নিয়ে হইহই রইরই পড়ে যাবে, তাঁর সময়কার বই পুস্তকে, চিঠিপত্রে, দলিল দস্তাবেজে লোকে লিখে রাখবে তাঁর কথা। আর পাঁচ জন ছাপোষা মানুষের মতোই তিনি সংসার করেছেন। অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন, বেশি দূর লেখাপড়া করার সুযোগ ছিল না। পরিবার-পরিজন, ঘর-সংসার ছিল আর ছিল টাকা-পয়সা উপার্জনের সমস্যা। বন্ধু-বান্ধব ছিল, শেষ বয়সে কাজে অবসর নিয়ে তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন বসে বসে। এক কথায়, যিনি অত বড় বড় নাটক লিখে গেছেন, তাঁর জীবনের ছক অন্য যে-কোনো মানুষের সঙ্গে মিলে যায়। তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেননি সত্যি, কিন্তু গোটা বিশ্বকেই তিনি বিদ্যালয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনকে তিনি পড়েছিলেন; কোথায় কোথায় মানুষের বেদনা, কোন কোন আঘাতে সে কাঁদে, তার হাসির রহস্য কোথায় কোথায়—তন্নতন্ন করে তা তিনি সারা জীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই, এই পড়াটা পরীক্ষা পাশের চেয়ে অনেক বেশি দামি। পরীক্ষা পাশ করা বিদ্বান লোক তাঁর সময়ে কিছু কম ছিলেন না, কিন্তু তাদের কজনকে লোকে মনে রেখেছে? কজনের খোঁজ আমরা জানি? অথচ শেক্সপিয়রের নাম আর কদর দেশে দেশে কালে কালে।

আরও একটা বিদ্যালয় শেক্সপিয়রের ছিল—সেটি রঙ্গমঞ্চ। তাঁর কালের তো বটেই, আগের কালেরও সব নাটক শেক্সপিয়র পড়েছেন, তাদের অভিনয় দেখেছেন ও করেছেন। কী করে নাটক লিখতে হয়, কোন ধরনের ভাষা নাটকে মানায় ভালো, কী কী থাকলে দর্শকরা খুশি হয়, এসব জিনিস শেক্সপিয়র হাতেনাতে শিখেছিলেন নাট্যশালায় কাজ করতে যেয়ে। নাটকের কায়দা-কানুন তাঁর কালে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানতেন না। তার কারণ, জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি কাটান নাট্যশালায়।

শেক্সপিয়রের জন্ম ইংল্যান্ডের ছোট এক মফস্বল শহর স্ট্র্যাটফোর্ড অন-অ্যাভনে। অ্যাভন নদীর ওপরে। জন্মের তারিখ ১৫৬৪ সালের ২৬শে এপ্রিল। বাবার নাম জন শেক্সপিয়র, মায়ের নাম মেরি আর্ডেন। শেক্সপিয়র শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় Shake & Spear অর্থাৎ যিনি বর্শা নাড়ান। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, শেক্সপিয়রের পূর্বপুরুষেরা হয়তো যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।



উইলিয়াম শেক্সপিয়র বাবা–মায়ের তৃতীয় সন্তান। তাঁর আগে তাঁদের দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু শেক্সপিয়রের এই বোন দুটি শৈশবেই মারা যায়। কাজেই প্রথম ছেলে ও এক মাত্র জীবিত সন্তান হিসেবে তিনি যে অনেক স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শেক্সপিয়রের জন্মভূমি স্ট্র্যাটফোর্ড এখন সারা দুনিয়ার মানুষের কৌতূহলের সামগ্রী। বিদেশ থেকে যাঁরা ইংল্যান্ডে যান, শেক্সপিয়রের সেই পুরনো শহরটিতে এক বার ঘুরে যেতে তাঁদের ভুল হয় না। কিন্তু শেক্সপিয়রের কালে এই শহরে এত মানুষের আনাগোনা ছিল না। ছোট, শান্ত একটি শহর। অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত, নিতান্ত সাদাসিধে। তবু একটা নীরব বৈশিষ্ট্য ছিল, অ্যাভন নদীর। ধীর, মন্থর, অগভীর। দু পাড়ের মানুষগুলোর মতো, স্ট্র্যাটফোর্ডের জীবনযাত্রার মতো।

এই শহরে শেক্সপিয়রের ছেলেবেলা কেটেছে। সমবয়সী আর পাঁচটি ছেলের মতো তিনিও এর পথে বিপথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বন দেখেছেন, দেখেছেন মাঠ, ওপরের আকাশ। বিশেষ করে অ্যাভন নদী। স্ট্র্যাটফোর্ডে মাঝে মাঝে লন্ডন থেকে অভিনেতাদের দল আসত। তখন ঐ ধীর প্রশান্ত জীবনে লাগত উত্তেজনার ঢেউ। শেক্সপিয়রের বাবা যখন শহরের মেয়র, তখন ছেলেকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন নাটকের অভিনয় দেখতে। স্থানীয় লোকেরাও নাটক করত মাঝে মাঝে। বালক শেক্সপিয়র সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন দেখতে। সেদিন কে জানত যে বাচ্চাদের সেই কৌতূহলী ভিড়ের ভেতর পৃথিবীর সেরা নাট্যকারটি লুকিয়ে ছিলেন!

সাত বছর যখন বয়স, তখন শেক্সপিয়র স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর কাটে আট বছর। বয়স যখন আঠারো, তখন তিনি বিয়ে করেন। তাঁর বাবার অবস্থা আগে বেশ ভালোই ছিল, এ সময়ে হঠাৎ খারাপ হতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে

শেক্সপিয়র দেশ ছাড়লেন, ভাগ্যের অন্বেষণে রওনা হলেন লন্ডনের দিকে। লন্ডনের জগৎ অন্যরকম, অনেক বড়, অনেক ব্যস্ত। এখানে এসে এক নাটকের দলের সঙ্গে জুটে গেলেন। কাজ নিলেন প্রম্পটারের, তারপর বাকি জীবন কেটেছে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেই। অভিনয় করেছেন, নাটক লিখেছেন, শেষে গ্লোব থিয়েটারের মালিকদের একজন হয়েছেন। এই যে লন্ডনে এলেন এবং রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলেন—এটা এমন একটা যোগাযোগ, যার কাছে শেক্সপিয়র নিজে তো বটেই, তাঁর দেশ তথা গোটা পৃথিবী চিরকাল ঋণী থাকবে।

লন্ডনে তখন মঞ্চের জন্য বছরে দুটি করে নাটক লিখতে হয় তাঁকে অর্থাৎ অবস্থাটা ছিল এখনকার দিনের খবরের কাগজের লোকদের মতো, যাদের পাতা ভরাবার জন্য রোজ গাদাগাদা করে লিখতে হয়। কিন্তু তাতে করে শেক্সপিয়রের নাটকের সৌন্দর্য কমে যায়নি। যে দর্শকদের জন্য তিনি লিখেছিলেন, কতশ বছর আগে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই মেজাজি অভিনেতাদের কেউ আজ টিকে নেই, কিন্তু নাটকগুলো আছে। সেকালের অনেক নাটক, অধিকাংশ নাটক ও তাদের দর্শক, অভিনেতা ও লেখকদের সঙ্গে তলিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, যায়নি শেক্সপিয়রের লেখা; কারণ, শুধু তাঁর কালের নয়, সকল কালের মানুষের মন জয় করবার জন্য তারা গড়া।

শেক্সপিয়র মারা যান ১৬১৬ সালে। সেই এপ্রিল মাসে—যে মাসে তিনি জন্মেছিলেন ২৩ তারিখ। স্ট্র্যাটফোর্ডে তখন বসন্তকাল। এমনি এক বসন্তে তিনি এসেছিলেন ঐ ছোট মফস্বল শহরে। দিকে দিকে তখন ইংল্যান্ডের জয়-জয়কার। জাহাজ ভাসিয়ে ইংল্যান্ডের লোক নতুন নতুন বন্দর আবিষ্কার করছে। প্রকাণ্ড শত্রুকে যুদ্ধে হারিয়ে দিচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার নবীন উৎসাহ। সেই গৌরবের দিনে জন্মগ্রহণ করে শেক্সপিয়র নতুন গৌরবের আলো এনে ফেলেছিলেন দেশের মুখে, তাঁর নিজের গাঁয়ে। সেদিনের ইংল্যান্ডের জন্য সব গৌরবের কথা এখন মওজুদ আছে ইতিহাস বইয়ের ঠাণ্ডা পাতায়, পাতাগুলো মলিন হয়ে উঠেছে হয়তো, কিন্তু শেক্সপিয়র বেঁচে আছেন জীবন্ত ও উষ্ণ হয়ে দেশ-বিদেশে হাজার হাজার পাঠকের সজীব মনে।

কার্লাইল মিথ্যে বলেননি, একটা সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় তিনি, সম্রাটের চেয়েও ক্ষমতাবান।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

মনীষী — মনীষার অধিকারী; অসাধারণ জ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি।
কার্লাইল — স্কটল্যান্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও লেখক। পুরো নাম টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১)।
ছাপোষা — যে অনেক সন্তান পালন করে।
কদর — আদর-যত্ন, মর্যাদা, সম্মান।
রঙ্গমঞ্চ — নাট্যশালা, থিয়েটার।
জমকালো — জাঁকালো, আড়ম্বরপূর্ণ।
অন্বেষণ — খোঁজ, সন্ধান।
প্রম্পটার — অভিনয়ের সময়ে নিচু গলায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ স্মরণ করিয়ে দেন যিনি, স্মারক।

পাঠ-পরিচিতি

'সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়' রচনায় লেখক বিশ্বের অন্যতম সেরা নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়রের জীবন ও কর্মের নানা দিক তুলে ধরেছেন।

মনীষী কার্লাইল শেক্সপিয়রকে আলাদাভাবে বিবেচনা করেছিলেন। ভারত সাম্রাজ্যের চেয়েও মূল্যবান ও বড় মাপের সম্পদ বলে তাঁকে বিবেচনা করতেন। বস্তুত মূল্যবান বিষয়সম্পত্তি বা ধনসম্পদ রেখে না গেলেও শেক্সপিয়র যে-কটি বই রেখে গেছেন, সেগুলোর মাধ্যমে তিনি নিজের দেশকে, কালকে অতিক্রম করে গেছেন। সব দেশের, সব কালের মানুষের কাছে তিনি পেয়েছেন মর্যাদার আসন।

মর্যাদার দিক থেকে বিশালত্বের অধিকারী হলেও শেক্সপিয়র ছিলেন আমাদের মতোই সাধারণ এক জন মানুষ। আর পাঁচ জনের মতোই তিনি ঘর–সংসার করেছেন। বেশি দূর লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। পরিবার–পরিজন, বন্ধু–বান্ধব নিয়ে সাধারণ মানুষের মতোই জীবন কাটিয়েছেন তিনি।

তবে তাঁর জীবনে অসাধারণত্বের দিকও ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়লেও জীবনকেই বিদ্যালয় হিসেবে নিয়েছিলেন। মানুষের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনাকে তিনি দেখেছেন অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে। শেক্সপিয়র আর একটি বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছিলেন, তা হল রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাটক লেখার কৌশল সম্পর্কে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তিনি।

শেক্সপিয়র ১৫৬৪ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শেক্সপিয়রের জীবন কেটেছে জন্মভূমি স্ট্র্যাটফোর্ড শহরে। সেই শান্ত শহর আর সেখানকার অ্যাভন নদীর স্মৃতি–বিজড়িত তাঁর ছেলেবেলা। সেখানেই লন্ডন থেকে আসা নাট্যদলের নাটকের অভিনয় দেখেছেন তিনি। হয়তো এটাই ভবিষ্যতের মহান নাট্যকার হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণা হয়েছিল।

শেক্সপিয়র স্কুলে বেশি লেখাপড়া করেন নি। পিতার আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় ভাগ্যের অন্বেষণে আসেন লন্ডনে। সেখানেই তিনি যুক্ত হন রঙ্গমঞ্চের সাথে, শুরু করেছিলেন প্রম্পটার হিসেবে। পরে অভিনয় করেছেন, নাটক লিখেছেন, শেষে থিয়েটারের মালিক হয়েছেন। লন্ডনে থাকাকালে মঞ্চের জন্য বছরে তাঁকে দুটো করে নাটক লিখতে হত। সেসব লেখা দর্শকদের চাহিদা পূরণের জন্য লেখা হলেও সেগুলো হয়ে আছে চিরায়ত সাহিত্যকর্মের নিদর্শন।

শেক্সপিয়রের মৃত্যু হয় ১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল।

শেক্সপিয়রের কালে ইংল্যান্ড প্রবেশ করেছিল সমৃদ্ধির যুগে। নতুন নতুন বন্দর আবিষ্কার, জ্ঞান–বিজ্ঞান চর্চায় প্রচণ্ড উৎসাহ ও অগ্রগতি শুরু হয়েছিল। ইংল্যান্ডের সেই গৌরবের যুগে শেক্সপিয়রের সাহিত্য–অবদান সেই গৌরবকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডের অন্যান্য গৌরব আজ অস্তমিত হলেও শেক্সপিয়র তাঁর নাটকের মাধ্যমে সারা বিশ্বের অগণিত পাঠকের মনে এখনও সজীব ও উষ্ণ হয়ে আছেন।

মনীষী কার্লাইল যথার্থই শেক্সপিয়রকে সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় বলে গণ্য করেছিলেন।

লেখক–পরিচিতি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তবে মননশীল লেখক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেই তিনি বেশি সুপরিচিত।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, ঢাকার বিক্রমপুরে। তাঁর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। শিশুদের জন্য লেখা তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে : 'দরজাটা খোল', 'হোমারের ওডিসি', 'ছোটদের শেক্সপিয়র'।

সাহিত্যচর্চায় অবদান রাখার জন্য তিনি বিভিন্ন পুরস্কারে সমাদৃত হয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৮) ও 'লেখক শিবির পুরস্কার' (১৯৭৫)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর খ্যাতি কী হিসেবে?

i খ্যাতিমান অধ্যাপক		ii. মননশীল প্রাবন্ধিক

iii. জীবনঘনিষ্ঠ নাট্যকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i		খ. ii

গ. i ও ii		ঘ. ii ও iii

২. শেক্সপিয়র কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. লন্ডন খ. স্ট্র্যামফোর্ড
গ. এডিনবরা ঘ. স্ট্র্যাটফোর্ড

৩. শেক্সপিয়র কোন দিক থেকে সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়?
ক. সম্পদের ও ক্ষমতার খ. খ্যাতি ও প্রতিপত্তির
গ. রচনার মাহাত্ম্যের ঘ. প্রচার প্রচারণার

৪. শেক্সপিয়র বেঁচে আছেন কোথায়?
ক. ইতিহাসের পাতায় খ. ব্রিটিশ ভূখণ্ডে
গ. পাঠকের হৃদয়ে ঘ. নাট্যশিল্পীদের মধ্যে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এমন অনেক কবি–সাহিত্যিক আছেন যাঁরা চিরঞ্জীব। এঁদের লেখা, এঁদের সৃষ্টি মানুষ চিরকাল উপভোগ করে। কেননা মানুষের চিরকালের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা, হাসি–কান্না এঁদের রচনার মধ্যে থাকে। তাই এঁদের রচনা অমূল্য, এঁরা সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান, সাম্রাজ্যের চেয়েও এঁরা বড়।

ক. কোন লেখককে সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় বলা হয়েছে?
খ. চিরকালের মানুষের উপভোগ্য হতে হলে লেখার বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত?
গ. তোমার পঠিত আনন্দদায়ক কোনো লেখার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
ঘ. 'সাম্রাজ্যের চেয়েও এঁরা বড়'–লেখকের এ মন্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পৃথিবীর অনেক বড় কবি–সাহিত্যিকগণ স্কুল–কলেজে পড়েননি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াননি। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা তাঁদের কাছে আনন্দদায়ক ছিল না বলেই এমনটা ঘটেছে। কিন্তু মানুষের জীবন ও প্রকৃতি নিয়ে তাঁদের ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁরা জয় করেছেন বিশ্বকে।

ক. শেক্সপিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন?
খ. প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বড় কবি–সাহিত্যিকদের খুব একটা আগ্রহ থাকে না কেন ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্ধৃতির অংশটুকু শেক্সপিয়ারের জীবনের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
ঘ. 'তাঁরা জয় করেছেন বিশ্বকে'—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আরও একটা বিদ্যালয় শেক্সপিয়রের ছিল সেটি রঙ্গামঞ্চ। তাঁর কালের তো বটেই, আগের কালেরও সব নাটক শেক্সপিয়র পড়েছেন, তাদের অভিনয় দেখেছেন ও করেছেন। কী করে নাটক লিখতে হয়, কোন ধরনের ভাষা নাটকে মানায় ভালো, কী কী থাকলে দর্শকরা খুশি হয়, এসব জিনিস শেক্সপিয়র হাতেনাতে শিখেছিলেন নাট্যশালায় কাজ করতে যেয়ে। নাটকের কায়দা–কানুন তাঁর কালে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানতেন না। তার কারণ, জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি কাটান নাট্যশালায়।

ক. শেক্সপিয়র কোন সময়ের নাট্যকার?
খ. রঙ্গামঞ্চকে কেন বিদ্যালয় বলা হয়েছে?
গ. নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অনুচ্ছেদের বক্তব্য কীভাবে সহায়ক হতে পারে? আলোচনা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নাট্যশিল্পী রূপে শেক্সপিয়রের মূল্যায়ন কর।



মুকুট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চরিত্র পরিচিতি

অমরমাণিক্য	মহারাজ
চন্দ্রমাণিক্য	যুবরাজ
ইন্দ্রকুমার	মধ্যম রাজকুমার
রাজধর	কনিষ্ঠ রাজকুমার
ধুরন্ধর	ঐ মামাতো ভাই
ইশা খাঁ	সেনাপতি
আরাকানরাজ	
প্রতাপ	
দূত — ১	
দূত — ২	

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ত্রিপুরার সেনাপতি ইশা খাঁ–র কক্ষ। ইশা খাঁ অস্ত্র পরিষ্কার করছেন]

রাজধর। দেখ সেনাপতি, আমার সম্মান যদি তুমি না রাখ তোমার সম্মানও আমি রাখব না।

ইশা খাঁ। আমার সম্মান যদি তোমার হাতে থাকবার ভার থাকত, তবে কানা কড়ার দরে তাকে হাটে বিকিয়ে আসতুম। নিজের সম্মান আমি নিজেই রাখতে পারব।

রাজধর। তাই যদি রাখতে চাও, তা হলে ভবিষ্যতে আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ। বটে!

রাজধর। হ্যাঁ।

ইশা খাঁ। হা হা হা হা! মহারাজাধিরাজকে কী বলে ডাকতে হবে? হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা!

রাজধর। আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার সে কথা তুমি ভুলে যাও।

ইশা খাঁ। সহজে ভুলি নি, তুমি যে রাজকুমার সে কথা মনে রাখা শক্ত করে তুলেছ।

[দ্বিতীয় রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ]

ইন্দ্রকুমার। খাঁ সাহেব, ব্যাপারখানা কী?

ইশা খাঁ। শোনো তো বাবা। বড় তামাশার কথা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিটি সকলের কনিষ্ঠ, এঁকে জাঁহাপনা শাহেন্‌শা বলে না ডাকলে ওঁর আর সম্মান থাকে না—ওঁর সম্মানের এত টানাটানি।

ইন্দ্রকুমার। বল কী! সত্যি নাকি! হা হা হা হা!

রাজধর। চুপ কর দাদা।

ইন্দ্রকুমার। তোমাকে কী বলে ডাকতে হবে? জাঁহাপনা! হা হা হা হা! শাহেন্‌শা!

রাজধর। দাদা, চুপ কর বলছি।

ইন্দ্রকুমার। জনাব, চুপ করে থাকা বড় শক্ত, হাসিতে যে পেট ফেটে যায় হুজুর।

রাজধর। তুমি অত্যন্ত নির্বোধ।

ইশা খাঁ। ওঁর বুদ্ধিটা সম্প্রতি বড়ই বেড়ে উঠেছে।

ইন্দ্রকুমার। নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না, মই লাগাতে হবে।

[অনুচরসহ যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য ও মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রবেশ]

রাজধর। মহারাজের কাছে আমার নালিশ আছে।

মহারাজ। কী হয়েছে?

রাজধর। ইশা খাঁ পুনঃপুন নিষেধ সত্ত্বেও আমার অসম্মান করেন। এর বিচার করতে হবে।

ইশা খাঁ। অসম্মান কেউ করে না, অসম্মান তুমি করাও। আরো তো রাজকুমার আছেন। তাঁরাও মনে রাখেন আমি তাঁদের গুরু। আমিও মনে রাখি তাঁরা আমার ছাত্র—সম্মান–অসম্মানের কোনো কথা ওঠে না।

মহারাজ। সেনাপতি সাহেব, কুমারদের এখন বয়স হয়েছে। এখন ওঁদের মান রক্ষা করে চলতে হবে বৈ কি।

ইশা খাঁ। মহারাজ যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করেছেন তখন মহারাজকে যে রকম সম্মান করেছি, রাজকুমারদের তা অপেক্ষা কম করি নে।

রাজধর। অন্য কুমারদের কথা বলতে চাই নে, কিন্তু—

ইশা খাঁ। চুপ কর বৎস। আমি তোমার পিতার সঙ্গে কথা বলছি। মহারাজ, মাফ করবেন, রাজবংশের এ কনিষ্ঠ পুত্রটি বড় হলে মুনশির মতো কলম চালাতে পারবে, কিন্তু তলোয়ার এর হাতে শোভা পাবে না। (যুবরাজ এবং ইন্দ্রকুমারকে দেখিয়ে) চেয়ে দেখুন মহারাজ, এরাই তো রাজপুত্র, রাজগৃহ আলো করে আছেন।

মহারাজ। রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলছেন ! তুমি অস্ত্রশিক্ষায় ওঁকে সন্তুষ্ট করতে পার নি ?

রাজধর। সে আমার ভাগ্যের দোষ, অস্ত্রশিক্ষার দোষ নয়। মহারাজ নিজে আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, এই আমার প্রার্থনা।

মহারাজ। আচ্ছা, উত্তম। কাল আমাদের অবসর আছে। কালই পরীক্ষা হবে। তোমাদের মধ্যে যে জিতবে, তাকে পুরস্কার দেব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[উদ্যানের পাশে রাজধর ও ধুরন্ধর]

রাজধর। একটা সুযোগ এসেছে। এইবার অস্ত্রপরীক্ষায় আমি লক্ষ্যভেদ করব। ইন্দ্রকুমারের অহংকারকে বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় করব।

ধুরন্ধর। অস্ত্র পরীক্ষায় ইন্দ্রকুমারকে জিতবে এইটেকেই সুযোগ বলছ ? জেতার সুযোগ কি হবে ?

রাজধর। সুযোগ কি তীরের মুখে থাকে ? সুযোগ বুদ্ধির ডগায়। তোমাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।

ধুরন্ধর। কাজ তো তোমার বরাবরই করে আসছি, তো কিছু পাই নে।

রাজধর। ফল সবুরে পাওয়া যায়। কোনো রকমে ফন্দিতে ইন্দ্রকুমার–দাদার অস্ত্রশালায় ঢুকে তাঁর তূণের প্রথম খোপটি থেকে তাঁর নাম লেখা তীরটি তুলে নিয়ে আমার নাম লেখা তীর বসিয়ে আসতে হবে। তার সঙ্গে আমার তীর বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।

ধুরন্ধর। সবই যেন বুঝলাম। কিন্তু আমার প্রাণটি ? সেটি গেলে তো কারও সঙ্গে বদল চলবে না।

রাজধর। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

ধুরন্ধর। তুমি তো বরাবরই আছ, কিন্তু ভয়ও আছে। সেই যখন ইন্দ্রকুমারের রুপোর–পাত–দেওয়া ধনুকটা লুকিয়ে শেষকালে ধরা পড়লুম তখন তো ভাই, তুমি ছিলে। রক্ষা কত করেছিলে সে আমার মনে আছে। ওই যে ওঁরা সব আসছেন, আমি পালাই।

তৃতীয় দৃশ্য

[ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বারে]

ইন্দ্রকুমার। কী হে প্রতাপ, ব্যাপারখানা কী ? আমাকে হঠাৎ অস্ত্রশালার দ্বারে যে ডাক পড়ল ?

প্রতাপ। মধ্যম বউরানীমা আপনাকে খবর দিতে বললেন যে, আপনার অস্ত্রশালার মধ্যে একটি জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন।

ইন্দ্রকুমার। বল কী প্রতাপ ?

প্রতাপ। আজ্ঞে, কুমার। দরজাটা খুললেই সমস্ত বুঝতে পারবেন।

ইন্দ্রকুমার। তাই তো বটে, পায়ের শব্দ শুনি যে! (দ্বার খুলতেই রাজধরের নিষ্ক্রমণ) এ কী! রাজধর যে! হা হা হা হা, তোমাকে অস্ত্র বলে কেউ ভুল করেছিল নাকি! হা হা হা হা!

রাজধর। মেজ বউরানী তামাশা করে আমাকে এখানে বন্ধ করে রেখেছিলেন।

ইন্দ্রকুমার। এ ঘরটা তো সহজ তামাশার ঘর না। এখানকার তামাশা যে ভয়ংকর ধারাল তামাশা, এখানে তোমার আগমন হল যে!

রাজধর। আজ রাতে শিকারে যাব বলে অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে দেখলুম, আমার অস্ত্রগুলোতে সব মর্চে পড়ে রয়েছে। কালকের অস্ত্র পরীক্ষার জন্যে সেগুলোকে সমস্ত সাফ করতে দিয়ে এসেছি। তাই বউরানীর কাছে এসেছিলুম তোমার কিছু অস্ত্র ধার নেবার জন্যে।

ইন্দ্রকুমার। তাই তিনি বুঝি সমস্ত অস্ত্রশালাসুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন! হা হা হা হা!

রাজধর। হাসো, হাসো। এ তামাশায় আমিও হাসব। কিন্তু এখন নয়।

চতুর্থ দৃশ্য

[পরীক্ষাভূমি]

ইশা খাঁ। যুবরাজ, সময় হয়েছে, ধনুক গ্রহণ কর। মনোযোগ কর। দেখো, হাত ঠিক থাকে যেন।

[যুবরাজের তীর নিক্ষেপ]

যাঃ ফসকে গেল।

যুবরাজ। মনোযোগ করেছিলুম খাঁ সাহেব। তীরযোগ করতেই পারলুম না।

ইন্দ্রকুমার। কখনো না। মন দিলে তুমি নিশ্চয়ই পারতে।

ইশা খাঁ। (রাজধরের প্রতি) কুমার, এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ কর। মহারাজ দেখুন।

রাজধর। আগে দাদার হোক।

ইশা খাঁ। এখন উত্তর করবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন কর।

[রাজধরের তীর নিক্ষেপ]

ইশা খাঁ। তোমার তীরও তোমার দাদার তীরের অনুসরণ করেছে—লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করে নি।

যুবরাজ। ভাই, তোমার বাণ অনেকটা নিকট দিয়েই গেছে। আর একটু হলেই লক্ষ্যবিদ্ধ করতে পারত।

রাজধর। লক্ষ্যবিদ্ধ তো হয়েছে। দূর থেকে তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না। ঐ যে বিদ্ধ হয়েছে।

যুবরাজ। না, রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে—লক্ষ্যবিদ্ধ হয় নি।

রাজধর। কাছে গেলেই প্রমাণ হবে।

ইশা খাঁ। ইন্দ্রকুমার, এবার তোমার পালা।

[ইন্দ্রকুমারের তীর নিক্ষেপ]

নেপথ্যে জনতা। জয়, কুমার ইন্দ্রকুমারের জয়।

[বাদ্য বেজে উঠল]

ইশা খাঁ। পুত্র, আল্লাহ্‌র কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক। মহারাজ, মধ্যমকুমার পুরস্কারের পাত্র।

রাজধর। না মহারাজ, পুরস্কার আমারই প্রাপ্য। আমারই তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

মহারাজ। কখনোই না।

রাজধর। সেনাপতি সাহেব পরীক্ষা করে আসুন কার তীর লক্ষ্যে বিঁধে আছে।

ইশা খাঁ। আচ্ছা, আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান]

[তীর হাতে নিয়ে ইশা খাঁর পুনঃপ্রবেশ]

(ইন্দ্রকুমারের প্রতি) বাবা, আমি বুড়ো মানুষ। চোখে তো ভুল দেখছি নে? এই তীরের ফলায় যেন রাজধরের নাম দেখা যাচ্ছে!

ইন্দ্রকুমার। (দেখে নিয়ে) হ্যাঁ, রাজধরেরই নাম।

মহারাজ। দেখি। (দেখে) তাই তো! একসঙ্গে আমাদের সকলেরই ভুল হল!

রাজধর। আজ নয় মহারাজ, আমার প্রতি বরাবরই ভুল হয়ে আসছে!

ইশা খাঁ। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার। আমি বুঝেছি।

ইশা খাঁ। কী হয়েছে বাবা? এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। তূণ বদল হয় নি তো?

রাজধর। কখনোই না। পরীক্ষা করে দেখ।

ইশা খাঁ। (দেখে) তাই তো দেখছি—তূণ তো ঠিকই আছে। আচ্ছা, বাবা ইন্দ্রকুমার, সত্য করে বল, এর মধ্যে তোমার অস্ত্রশালায় কেউ কি প্রবেশ করেছিল?

ইন্দ্রকুমার। সেকথার প্রয়োজন নেই খাঁ সাহেব। ও কথা থাক।

ইশা খাঁ। তা হলে তুমি হার মানছ?

ইন্দ্রকুমার। হ্যাঁ, আমি হার মানছি।

ইশা খাঁ। শাবাশ বাবা, শাবাশ! তুমি রাজার ছেলে বটে। মহারাজ, কোথাও একটা কিছু অন্যায় হয়ে গেছে, সে-কথা প্রকাশ হচ্ছে না। আর একবার পরীক্ষা না হলে ঠিক মত মীমাংসা হতে পারবে না।

রাজধর। খাঁ সাহেব, অন্যায় আর কিছু নয়, আমার জেতাই অন্যায় হয়েছে।

ইশা খাঁ। মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক। দেখা যাবে তাতে আপনার কোন্ পুত্র পুরস্কার আনতে পারে।

মহারাজ। কোন্ কাজের কথা বলছ সেনাপতি?

ইশা খাঁ। আরাকান-রাজ্যের সঙ্গে মহারাজের যুদ্ধের মতলব আছে। সৈন্যও তো প্রস্তুত হয়েছে। এইবার কুমারদের সেই যুদ্ধে পাঠানো হোক।

মহারাজ। ভালো কথাই বলেছ সেনাপতি। খবর পেয়েছি আরাকানের রাজা চট্টগ্রামের সীমানার কাছে এসেছেন। ইশা খাঁ, তুমি সৈনাধ্যক্ষ হয়ে এঁদের সকলকে শত্রু বিজয়ে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাজধরের শিবির]

ধুরন্ধর। তুমি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তফাতে থাকবে নাকি ?

রাজধর। হাঁ—ইশা খাঁর কাছে আমি এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলুম।

ধুরন্ধর। সে তো আমি জানি। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলুম। তাই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়ে গেল।

রাজধর। কী রকম ?

ধুরন্ধর। প্রথমেই তো ইন্দ্রকুমার অট্টহাস্য করে উঠলেন। তিনি বললেন, রাজধরের যুদ্ধপ্রণালীটাই ঐরকম। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে থেকেই তিনি যুদ্ধ করতে ভালবাসেন।

রাজধর। সেকথা ঠিক। দূরে থেকে যে যুদ্ধ করতে পারে সেই যোদ্ধা। ইশা খাঁ কী বললেন ?

ধুরন্ধর। ইশা খাঁ বললেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধর তফাতে থাকতে চান সেটা তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়। কিন্তু পাঁচ হাজার সৈন্য সঙ্গে রাখতে চান সেইটে আমার ভালো ঠেকছে না।

রাজধর। যুবরাজ কিছু বললেন না ?

ধুরন্ধর। যুবরাজের অনুরোধেই তো ইশা খাঁ তোমার প্রস্তাবে রাজি হলেন। নইলে তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল না। যাই হোক, আমি কিন্তু তোমার আলাদা থাকবার মতলব ভালো বুঝতে পারছি নে।

রাজধর। ওঁদের সঙ্গে একত্রে মিলে যুদ্ধ করে আমার লাভ কী ? জিত হলে সে জিতকে কেউ আমার জিত বলবে না তো।

ধুরন্ধর। কিন্তু তফাতে বসে থাকলে যুদ্ধে জয় হলেও তোমার অপযশ, হারলে তো কথাই নেই।

রাজধর। আমার ওই পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়েই আমি যুদ্ধে জিতব এবং আমি একলাই জিতব। [দূতের প্রবেশ]

কী রে, যুদ্ধের খবর কী ?

দূত। আজ্ঞে, লড়াই তো সমস্ত দিন ধরেই চলেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত এঁরা শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করতে পারেন নি।

[দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ]

রাজধর। কে তুমি ?

দ্বিতীয় দূত। আজ্ঞে, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়েছেন—সেও প্রায় দুই প্রহর হয়ে গেল—আপনার যেখানে সৈন্য নিয়ে থাকবার কথা ছিল, সেখানে আপনাদের না পেয়ে বহু সন্ধানে এখানে এসেছি।

রাজধর। যুবরাজের আদেশ কী ?

দূত। শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আমরা যে রকম অনুমান করেছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধ খুব

কঠিন হয়ে এসেছে। কুমার ইন্দ্রকুমার তাঁর অশ্বারোহী দল নিয়ে শত্রুসৈন্যের উত্তর দিক আক্রমণ করেছিলেন। শত্রুসৈন্যকে প্রায় টলিয়ে এনেছেন, এমন সময় খবর পেলেন যে যুবরাজ সংকটে পড়েছেন, শত্রু তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। ইশা খাঁ তখন অন্য দিকে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন।

রাজধর। দাদা কি তবে—

দূত। না, তাঁর কোনো বিপদ ঘটে নি। ইন্দ্রকুমার সৈন্য নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু আপনার সাহায্য না পেলে বিপদ ঘটতেও পারে। অতএব আপনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব করবেন না।

রাজধর। না, কিছুমাত্র বিলম্ব করব না। যাও। বিশ্রাম করো গে। আমি প্রস্তুত হচ্ছি।

[দূতের প্রস্থান]

ধুরন্ধর। তুমি যাচ্ছ নাকি ?

রাজধর। যাচ্ছি বটে, কিন্তু ও দিকে নয়, অন্য দিকে।

ধুরন্ধর। কী তোমার অভিপ্রায় খুলেই বল না –

রাজধর। আজ রাতের অন্ধকারে আমি সৈন্য নিয়ে গোপনে নদী পার হয়ে যাব। হঠাৎ আরাকানরাজের শিবিরে উপস্থিত হয়ে তাকে বন্দি করতে হবে। সূর্য তো অস্ত গেল। তুমি যাও, প্রস্তুত হও গে। আর একটি কাজ কর–যুবরাজের দূত যেন ফিরে যেতে না পারে। তাকে বন্দি করে রাখ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আরাকান–রাজের শিবির]

আরাকান–রাজ। দেখুন রাজকুমার, আমাকে বন্দি করে আপনাদের কোনো লাভ নেই।

রাজধর। কেন লাভ নেই রাজন? এই যুদ্ধের মধ্যে আপনাকে লাভ করাই তো সব চেয়ে বড় লাভ।

আরাকান–রাজ। তাতে যুদ্ধের অবসান হবে না। আমার ভাই হামচু রয়েছে। সৈন্যরা তাকেই রাজা করবে। যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।

রাজধর। আপনাকে মুক্তিই দেব। কিন্তু সেটা তো একেবারে বিনা মূল্যে দেওয়া চলবে না।

আরাকান–রাজ। সে আমি জানি, মূল্য দিতে হবে। আমি পরাজয় স্বীকার করে সন্ধিপত্র লিখে দিতে রাজি আছি।

রাজধর। শুধু সন্ধিপত্র দিলে তো হবে না মহারাজ। আপনি যে পরাজয় স্বীকার করলেন, তার কিছু নিদর্শন তো দেশে নিয়ে যেতে হবে, মহারাজের মাথার মুকুট আমাকে দিতে হবে।

আরাকান–রাজ। তার চেয়ে প্রাণ দেওয়া সহজ।

রাজধর। প্রাণ দিলেও মুকুটটি তো বাঁচাতে পারবেন না। মাঝের থেকে প্রাণটাই বৃথা যাবে।

আরাকান–রাজ। তবে মুকুট নিন। কিন্তু এই মুকুটের সঙ্গে আরাকানের চিরস্থায়ী শত্রুতা আপনি ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।

রাজধর। এই তো রাজার মতো কথা। তবে চলুন, সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করা যাক।

তৃতীয় দৃশ্য

[রণক্ষেত্র]

ইন্দ্রকুমার। এ কী ! শত্রুসৈন্যরা হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ করল যেন !

যুবরাজ। ঐ–যে সন্ধি নিশান উড়ছে! ওদের তো পরাজয়ের কোনো লক্ষণ ছিল না। তবে কেন এমন ঘটল?

[দূতের প্রবেশ]

দূত। যুবরাজ, শত্রুপক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়েছে।

যুবরাজ। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এর কারণ কী?

দূত। শুনতে পেয়েছি আরাকানরাজ আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

যুবরাজ। সুসংবাদ। আমার কেবল মনে একটি বেদনা বাজছে।

ইন্দ্রকুমার। কিসের বেদনা দাদা?

যুবরাজ। রাজধর কেন সৈন্য নিয়ে চলে গেল। সে যদি থাকত, তা হলে কী আনন্দের সঙ্গে আমরা তিন ভাই জয়োৎসব করতে পারতুম। রাজধর যুদ্ধে যোগ না দিয়ে আমাকে বড় দুঃখ দিয়েছে। ঐ যে ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতি সাহেব আসছেন।

[ইশা খাঁর প্রবেশ]

ইন্দ্রকুমার। খাঁ সাহেব, শত্রুসৈন্য হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়ে দিল কেন তার কোনো খবর পেয়েছ?

ইশা খাঁ পেয়েছি বৈ কি! রাজধর আরাকানরাজকে বন্দি করেছে।

ইন্দ্রকুমার। রাজধর! মিথ্যা কথা !

ইশা খাঁ। যা মিথ্যা হওয়া উচিত ছিল, এক এক সময় তাও সত্য হয়ে ওঠে।

যুবরাজ। কখন সে যুদ্ধ করলে, কখন বা বন্দি করলে আমরা তো জানতে পারি নি।

ইশা খাঁ। কাল সন্ধ্যার পরে আমরা যখন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে শিবিরে ফিরে এলেম, তখন সে অন্ধকারে গোপনে নদী পার হয়ে হঠাৎ আরাকানরাজের শিবির আক্রমণ করে তাঁকে বন্দি করেছে। আমাদের সাহায্য করবার জন্য আমি তাঁকে যেখানে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলুম, সেখানে সে ছিলই না। আমি সেনাপতি, আমার আদেশ সে মান্যই করে নি।

ইন্দ্রকুমার। অসহ্য। এ জন্যে তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

ইশা খাঁ। শুধু তাই ! যুবরাজ উপস্থিত থাকতে সে কিনা ইচ্ছামতো সন্ধিপত্র রচনা করেছে!

ইন্দ্রকুমার। এর শাস্তি না দিলে অন্যায় হবে।

[রাজধরের প্রবেশ]

রাজধর, তুমি কাপুরুষতা করেছ।

রাজধর। তোমার মতো যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পুরুষকার প্রকাশ করতে আমি এত দূরে আসি নি—আমি যুদ্ধ জয় করতে এসেছিলুম।

ইন্দ্রকুমার। তুমি যুদ্ধ করেছ? এবং জয় করেছ!

রাজধর। হ্যাঁ, তার সাক্ষী এই। (মুকুট প্রদর্শন)

ইন্দ্রকুমার। এ মুকুট কার?

রাজধর। এ মুকুট আমার। এ আমার জয়ের পুরস্কার।

ইন্দ্রকুমার। যুদ্ধ থেকে পালিয়েছ তুমি। তুমি পুরস্কার পাবে কিসের! এ মুকুট যুবরাজ পরবেন।

রাজধর। আমি জিতে এনেছি, আমিই পরব।

যুবরাজ। রাজধর ঠিক কথাই বলছে। ওর জয়ের ধন তো ওই পরবে।

ইশা খাঁ। সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করে উনি অন্ধকারে শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করলেন—আর উনি পরবেন মুকুট!

যুবরাজ। সত্যি বলতে কি, রাজধর না থাকলে আজ আমাদের বিপদ হত।

ইন্দ্রকুমার। কিচ্ছু বিপদ হত না। রাজধর সৈন্য লুকিয়ে রেখেই আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। রাজধর না থাকলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করে আনতুম। রাজধর চুরি করে এনেছে। দাদা এ মুকুট এনে আমি তোমাকেই পরাতুম, নিজে পরতুম না।

যুবরাজ। (রাজধরের প্রতি) ভাই, তুমিই আজ জিতেছ। এ মুকুট আমি তোমাকেই পরিয়ে দিচ্ছি।

ইন্দ্রকুমার। (রুদ্ধ কণ্ঠে) রাজধর ক্ষাত্রধর্ম লঙ্ঘন করেও তোমার কাছ থেকে পুরস্কার পেলে! আর আমি যে প্রাণ তুচ্ছ করে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলুম, তোমার মুখ থেকে একটা প্রশংসার কথাও শুনতে পেলুম না। কেন দাদা, আমি কি প্রত্যুষ থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই করি নি। আমি কি রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিলুম! আমি কি শত্রুসৈন্যের বেষ্টন ছিন্ন করে তোমার সাহায্যের জন্য আসি নি!

যুবরাজ। ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলছি নে।

ইন্দ্রকুমার। থাক দাদা, থাক। আর কিছুই বলতে হবে না। রাজধরের মতো এমন অসাধারণ বীরকে যখন তুমি সহায় পেয়েছ, তখন আমাদের আর প্রয়োজন নেই—আমি চললেম।

[প্রস্থান]

ইশা খাঁ। যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাউকে দেবার অধিকার নেই। আমি সেনাপতি, আমি যাকে দেব এ তারই হবে।

[রাজধরের মাথা থেকে মুকুট নিয়ে যুবরাজকে পরিয়ে দিতে উদ্যত হলেন]

যুবরাজ। (সরে গিয়ে) না, এ মুকুট আমি নিতে পারি নে।

ইশা খাঁ। তবে থাক। এ মুকুট কেউ পাবে না। এ কর্ণফুলির জলে যাক। (মুকুট নিক্ষেপ) রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। উনি শাস্তির যোগ্য।

(সংক্ষেপিত ও সামান্য পরিবর্তিত)

শব্দার্থ ও টীকা

ধনুর্বিদ্যা — তীর নিক্ষেপের কৌশলসংক্রান্ত বিদ্যা।

ভ্রম — ভুল, ভ্রান্তি, প্রমাদ।

অপযশ — অখ্যাতি, দুর্নাম।

সন্ধিপত্র — যুদ্ধকালে বা যুদ্ধশেষে সন্ধি করা শর্তযুক্ত চুক্তিপত্র।

শৃগালবৃত্তি অবলম্বন — শঠতার আশ্রয় নেওয়া, লোকঠকানোর কৌশল অবলম্বন।

ক্ষাত্রধর্ম — ক্ষত্রিয়ের বা যোদ্ধার অবশ্যপালনীয় রীতিনীতি।

ক্ষাত্রধর্ম লঙ্ঘন — যোদ্ধার নিয়মনীতিকে মান্য না করা।

প্রত্যুষ — ভোর, উষাকাল।

পাঠ–পরিচিতি

ত্রিপুরার রাজপরিবারের তিন জন রাজকুমারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে 'মুকুট' নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই তিন জন রাজপুত্রই তাঁদের অস্ত্রগুরু ও রাজ–সেনাপতি ইশা খাঁর কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছেন। এঁদের মধ্যে মধ্যম কুমার ইন্দ্রকুমার হচ্ছেন অস্ত্রনিপুণ ও বীরযোদ্ধা এবং উদার মনের অধিকারী। সেইজন্য তিনি ইশা খাঁর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। কনিষ্ঠ কুমার রাজধর অস্ত্রবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং চরিত্রের দিক থেকে নীচ ও কুটিল স্বভাবের বলে ইশা খাঁর বিরাগভাজন।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, রাজধর বংশগৌরব ও আত্মমর্যাদার অন্ধ গরিমায় অস্ত্রগুরু ইশা খাঁর কাছে নিজের পদমর্যাদার উপযোগী সম্মান দাবি করেছেন। এ নিয়ে ইশা খাঁ বিদ্রূপাত্মক জবাব দিলে এবং ইন্দ্রকুমার তা নিয়ে উপহাস করলে রাজধর খেপে যায়। ক্ষোভে সে মহারাজের কাছে এ নিয়ে নালিশ করলে ইশা খাঁ রাজধরের দুর্বলতাগুলো মহারাজের কাছে স্পষ্ট করে চিহ্নিত করেন। অপমানিত হয়ে রাজধর অস্ত্রপরীক্ষার দাবি জানালে মহারাজ তাতে সম্মত হন এবং বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদানের আশ্বাস দেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়, রাজধর ইন্দ্রকুমারকে কৌশলে হারানোর জন্য মামাতো ভাই ধুরন্ধরের সঙ্গে গোপন পরামর্শে লিপ্ত। রাজধরের চক্রান্ত থেকে তার চরিত্রের কুটিল দিকটি এই দৃশ্যে ধরা পড়েছে।

তৃতীয় দৃশ্যে পাঠকের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজধরের মন কতটা নীচ ও কুটিল। সে গোপনে নিজের নামাঙ্কিত তীর ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় রেখে আসে এবং ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত তীর চুরি করে নিয়ে আসে।

চতুর্থ দৃশ্যে আমরা তিন কুমারকে তীরচালনার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে দেখি। যুবরাজ ও রাজধর লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়। ইন্দ্রকুমার লক্ষ্যভেদে সম্পূর্ণ সফল হলেও রাজধরের অপকৌশলের কাছে পরাভূত হয়। মহারাজ ও সেনাপতিসহ সব দর্শক যদিও চোখে দেখলেন যে, ইন্দ্রকুমার লক্ষ্যভেদ করেছেন কিন্তু স্বয়ং ইশা খাঁ বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, লক্ষ্যভেদ–করা তীরটি রাজধরের নামাঙ্কিত। ফলে প্রতারক রাজধরের বিজয় হল। ইশা খাঁ এটি বিশ্বাস করেননি, তিনি সন্দেহ করলেন—সম্ভবত তীর বদল হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রকুমার ব্যাপারটি বুঝতে পারা সত্ত্বেও পরাজয় মেনে নিলেন। ইশা খাঁ আর একবার পরীক্ষা করে ব্যাপারটি যথাযথভাবে যাচাই করার পরামর্শ দেন এবং ত্রিপুরা আক্রমণোদ্যত আরাকানরাজের বিরুদ্ধে তিন পুত্রকে যুদ্ধ করে যোগ্যতা প্রমাণের জন্য মহারাজের কাছে প্রস্তাব দেন। মহারাজ তাতে সম্মতি জানিয়ে ইশা খাঁকে এ অভিযানের অধিনায়ক করে দেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজধরের সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি ও চক্রান্তকারী ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধুরন্ধরের সঙ্গে তার আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সে যুদ্ধে যোগ না দিয়ে পাঁচ হাজার সৈন্যকে নিজের অধীনে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকার জন্য ইশা খাঁর কাছে প্রস্তাব দেয়। ইশা খাঁ তার প্রস্তাব শুনে বিস্মিত ও সংশয়ান্বিত হলেও যুবরাজের অনুরোধে তাতে সম্মত হন। রাজধর যুদ্ধে অংশ না নিয়ে, শত্রুর মোকাবেলায় যুবরাজের বিপজ্জনক অবস্থার কথা শুনেও রাতের অন্ধকারে গোপনে নদী পার হয়ে আরাকানরাজের শিবির আক্রমণ করে তাঁকে বন্দি করে। রাজধর আরাকানরাজকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর, আক্রমণ প্রত্যাহার ও পরাজয়ের নিদর্শন হিসেবে তার হাতে নিজের মুকুট তুলে দিতে বাধ্য করে।

শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, আরাকানরাজ হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে দিলে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুজনই অবাক হয়ে যান। ইশা খাঁর কাছ থেকে তারা সঠিক তথ্য জানতে পারেন। ইশা খাঁ রাজধরকে সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেন। ইন্দ্রকুমার রাজধরের কাপুরুষোচিত আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানান। পক্ষান্তরে, যুবরাজ রাজধরের বুদ্ধির প্রশংসা করে বিজয়গৌরবের চিহ্ন হিসেবে তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন। কিন্তু এতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে যুদ্ধে যুবরাজের প্রাণরক্ষাকারী ইন্দ্রকুমার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। ঐ উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে

ইশা খাঁ ঘোষণা করেন যে, সেনাপতি হিসেবে তিনিই দণ্ড ও পুরস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। তিনি বিজয়ের প্রতীক মুকুটটি রাজধরের মাথা থেকে খুলে নিয়ে যুবরাজকে পরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। কিন্তু যুবরাজ তা পরতে অস্বীকৃতি জানালে ইশা খাঁ ভাইদের মধ্যে বিরোধের প্রতীক মুকুটটিকে কর্ণফুলি নদীর জলে নিক্ষেপ করেন।

লেখক–পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয়নি। সতের বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে পড়াও শেষ না হতেই তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনায় তিনি একক অবদানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত—সাহিত্যের সকল শাখাই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত একটি সংগীত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। সেগুলো সংকলিত হয়েছে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র ৩০টি খণ্ডে। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে 'কৈশোরক' নামে একটি সংকলনে।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) ৮০ বছর বয়সে কলতাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শৃগালবৃত্তি শব্দের অর্থ–
   - ক. শৃগালের মতো জীবনযাপন
   - খ. লোক ঠকানোর কৌশল
   - গ. বুদ্ধির সঙ্গে কাজ করা
   - ঘ. কার্যসিদ্ধিতে কৌশলের আশ্রয়

২. তোমার পাঠ্যপুস্তকের 'মুকুট' নাটিকার প্রথম অঙ্কে কয়টি দৃশ্য?
   - ক. ৩টি
   - খ. ৪টি
   - গ. ৫টি
   - ঘ. ৬টি

৩. কার তীর লক্ষ্যভেদ করেছিল?
   - ক. রাজধরের
   - খ. ইন্দ্রকুমারের
   - গ. চন্দ্রমাণিক্যের
   - ঘ. ইশা খাঁর

৪. ইন্দ্রকুমার কেমন প্রকৃতির লোক
   - ক. প্রতিশোধপরায়ণ
   - খ. পরশ্রীকাতর
   - গ. মহৎ
   - ঘ. সময়ানুবর্তী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

অযোগ্য লোকেরা চিরকালই বাঁকা পথে চলে। তারা বাঁকা পথেই সাফল্য লাভ করতে চায়। ফলে তাদের আশ্রয় নিতে হয় অন্যায়ের, মিথ্যার, ষড়যন্ত্রের, প্রতারণার। সেই পথে কখনো কখনো সাফল্য আসে, কিন্তু কখনোই তা গৌরবের হয় না।

ক. উদ্ধৃতিটি পড়ে 'মুকুট' নাটকের কোন চরিত্রটি তোমার মনে পড়ে?

খ. বাঁকা পথের সাফল্য গৌরবের হয় না এই বক্তব্যের আলোকে রাজধরের প্রকৃতি লেখ।

গ. উদ্ধৃতির আলোকে রাজধরের স্বভাব-প্রকৃতির পরিচয় দাও।

ঘ. রাজধরের চরিত্র বিচার করতে উদ্ধৃতিটি কীভাবে সহায়ক হবে? আলোচনা কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আজ রাতের অন্ধকারে আমি সৈন্য নিয়ে গোপনে নদী পার হয়ে যাব। হঠাৎ আরাকানরাজের শিবিরে উপস্থিত হয়ে তাকে বন্দি করতে হবে। সূর্য তো অস্ত গেল। তুমি যাও, প্রস্তুত হও গে। আর একটি কাজ কর—যুবরাজের দূত যেন ফিরে যেতে না পারে। তাকে বন্দি করে রাখ।

ক. উদ্ধৃতিটির রচয়িতা কে?

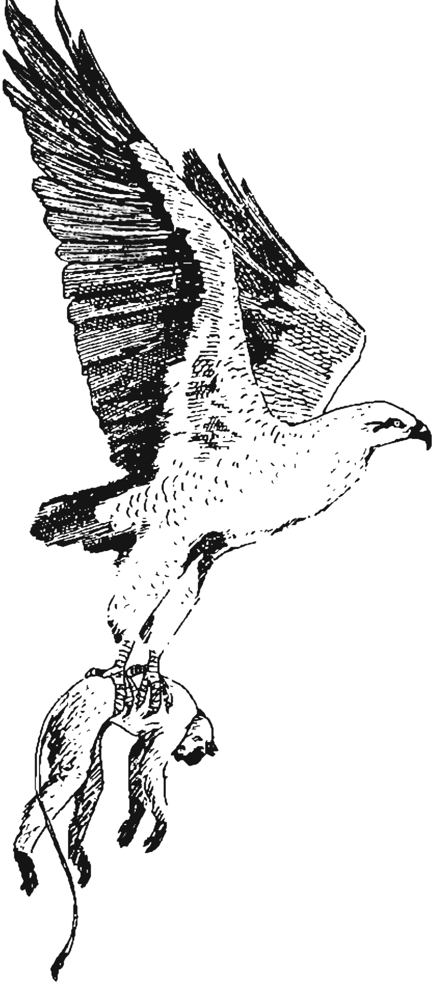
খ. 'তুমি যাও, প্রস্তুত হও গে।' কার উদ্দেশে এই উক্তি করা হয়েছে?

গ. যুবরাজের দূতকে বন্দি করে রাখার ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্ধৃত অংশের ভিত্তিতে রাজধরের প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ কর।

মহাবন আমাজান

নওয়াজেশ আহমেদ



পৃথিবীর সব থেকে বড় ও বিস্ময়কর বন আমাজানের মহাবন। এক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বলেন, 'আমাজান বনরাজ্য হচ্ছে জীববিজ্ঞানের এক বিরাট লাইব্রেরি, ভেষজ রসায়নের পৃথিবীর বৃহত্তম ল্যাবরেটরি, বিশ্ব আবহাওয়ার প্রাণকেন্দ্র।' এই প্রগাঢ় আমাজানের ব্যাপকতা কল্পনাতীত—হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত। এই বনাঞ্চল উঁচু-নিচু ও কিছু জলাবদ্ধ প্রায় সমতলভূমি।

দক্ষিণ আমেরিকার নয়টা দেশ নিয়ে এই বনরাজ্য—উত্তরে ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, গায়ানা ও সুরিনাম; পশ্চিমে পেরু, একোয়াডোর এবং দক্ষিণে বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে। আর মাঝখানে বিশাল দেশ ব্রাজিল। এই বন এত ঘন যে, একটি বানর আন্দেজ পর্বতের পাদদেশ থেকে অনায়াসে ২০০ ফুট উঁচু গাছের ওপর দিয়ে ২০০০ মাইল পাড়ি দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পৌঁছতে পারে। আর আমাজান নদী ৪০০০ মাইলের ব্যাপ্তি এবং ১০০০ শাখা-প্রশাখা নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে এই মহাবনে।

এই জঙ্গল এত ঘন সন্নিবেশিত ও সজীব যে, পৃথিবীর সব প্রাণিবিজ্ঞানীকে একত্র করলেও এর সঠিক হদিস নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়বে। এই বিশাল বনরাজ্যের অনেক গহিন জায়গা আছে, যেখানে আদিম যুগ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি।



বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের জন্য আমাজান বিখ্যাত নয়। জীবজন্তুর দিক থেকে এই মহাবন সমৃদ্ধ হচ্ছে পোকামাকড়, বহু রঙের বিষাক্ত ব্যাঙ এবং হাজার জাতের প্রজাপতির ওড়াউড়িতে। আর দেখতে পাওয়া যায় পাতা-খাওয়া পিঁপড়া আর পিয়াম নামের ভয়ংকর ছোট কালো মাছি। এই বনে কোনো হাতি, সিংহ ও গণ্ডার দেখা যায় না। এই মহাজঙ্গলে মানুষের বসতি খুবই পাতলা। এক হিসেবে দেখা যায়, এই বিরাট এলাকায় মাত্র ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। রেড ইন্ডিয়ান উপজাতির সংখ্যাও মাত্র ২ লক্ষের মতো। এরা বহু উপজাতিতে বিভক্ত। নদীর পাড়েই এদের বাস। মাছ ধরা, শিকার করা, রবার সংগ্রহ, জুমচাষই এদের প্রধান জীবিকা। এদের মধ্যে চিরচা ও কেচুয়া সম্প্রদায় কিছুটা উন্নত।

ওপর দিয়ে উড়োজাহাজে উড়ে গেলে আমাজানকে মনে হবে দিগন্তবিস্তৃত ছেদহীন বৃক্ষ সমারোহের এক সবুজ মহাসাগর। আমাজানের গহিন জঙ্গলে প্রবেশ করতে কেউ বড় একটা সাহস করে না। প্রবাদ আছে—বনের ভেতর এমন অনেক জায়গা আছে, যেখান থেকে কেউ ফেরত আসে না। কারণ, হয়তো বড় বড় গাছের এই গহিন বনের নিচে সূর্যের আলোক বড় একটা পড়ে না, বেশ অন্ধকার; তাই লোকে পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি সাহস করে বনের ভেতর ঢুকে পড়ে, তা হলে তার অনুসন্ধানী চোখে কেমন ধরা পড়বে সে বনের ভেতরটা?

ভর দুপুরবেলায়ও সেখানে অন্ধকার মনে হবে। নানা পোকা–মাকড় ও পাখির কলগুঞ্জনে বনানী মুখর। প্রথমে খুব ঘন লতাপাতার গাছ নজরে পড়বে। এর ভেতর দিয়ে যাতায়াত করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। মাঝে মাঝেই বনমুরগি, কাছিম, বড় জাতের গুইসাপ সামনে পড়বে। এদের ভয় করার কিছু নেই। তবে পিয়াম নামের ছোট ছোট কালো মাছির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এরা ভয়ংকর—কামড়ালে বহু দিন পর্যন্ত ভুগতে হবে। বন যত গহিন হবে, নিচের ছোট ছোট গাছগাছড়া তত কমে যাবে। এক সময় দেখা যাবে ঝোপঝাড় একদম নেই, ভীষণ স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার—তখন বুঝতে হবে গভীর জঙ্গলে তুমি প্রবেশ করেছ। নিচ দিয়ে শুধু লম্বা লম্বা গাছের গুঁড়ি। এই ঘন সন্নিবেশিত গাছের ফাঁক দিয়ে রাস্তা করে নিতে হবে। লক্ষ লক্ষ বছরের মধ্যে এই ভেজা মাটিতে তোমার পায়ের দাগ হবে হয়তো প্রথম মানুষের পদসঞ্চারের প্রমাণ। এ বন আদিম—যুগ যুগ ধরে নির্ঝঞ্ঝাটে বিদ্যমান। মাটির ওপরে সব গাছের বড় বড় কাণ্ডই প্রায় একরকম মসৃণ মনে হবে। কোনটা কোন গাছের কাণ্ড বোঝার উপায় নেই। একদম ওপরে না গেলে চেনা যাবে না তাদের।

তাই যদি মোটা দড়ির সাহায্যে ২০০ ফুট ওপরে উঠতে পার, মানে গাছের আগায়, তা হলে দেখতে পাবে, এদের বৈচিত্র্যের বাহার। ৫০ ফুট ওপরে উঠলেই দেখতে পাওয়া যাবে গাছের মসৃণ কাণ্ড জটাধারী হয়ে গেছে—নানা ধরনের পরগাছা, মস ও ফার্ন জাতীয় গাছে জড়িয়ে আছে। এইসব আবরণের জন্য গাছের কাণ্ড বড় একটা দেখা যাবে না। হঠাৎ দেখতে পাওয়া যাবে—কলকাকলিতে মুখর নানা ধরনের রংবেরঙের ছোট ছোট পাখি আর প্রজাপতি। ফুলের মিষ্টি



গন্ধের আঁচ পাওয়া যাবে, তবে এ স্তরের বাতাসকে অত্যন্ত ভারী, গরম ও দম–আটকানো মনে হবে। আরও ১০০ ফুট ওপরে উঠে গেলে ডালপালা ও রংবেরঙের পাতার জগতে ডুবে যেতে হবে। বুঝতে হবে এই মহাবনের প্রায় মাথার কাছে আসা হয়েছে। মাথা থেকে এই নিবিড় ডালপালা ও পাতার জগৎ ৩০ ফুটের মতো গভীর। এই তলাই হচ্ছে আমাজান মহাবনের বৈশিষ্ট্য। মনে হবে পৃথিবীর বৃক্ষ–জগতের এক বিরাট অংশ এখানে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাখি ও পোকা–মাকড়ের কলগুঞ্জনে এ জগৎ মুখর। কত বিচিত্র ধরনের ডালপালা, পাতার আকার, রং আর তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গি। বোর্নিওর ঘন জঙ্গল ছাড়া প্রাণচাঞ্চল্যের এমন নিবিড় দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি হাজার হাজার রংবেরঙের হামিং বার্ডের কিচির–মিচিরে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। অবাক হয়ে দেখতে হবে লম্বা সরু ঠোঁট দিয়ে কেমন দক্ষতার সঙ্গে প্রায় প্রজাপতির সমান এই পক্ষী মৌমাছির মতো মধু সংগ্রহ করছে ফুলে ফুলে। কত বিচিত্র রঙের ও আকারের ফুলসম্ভারে এ স্তর শোভিত ! সব ঋতুতেই হাজার রকম ফুল ফুটে থাকে। ডালে ডালে কত রকমের অর্কিডের উজ্জ্বল ও সুরভিত সমাহার। হঠাৎ এক কর্কশ চিৎকারে এই দম–আটকানো বাতাস চমকে উঠবে। দেখবে, বিরাট এক ঈগল পাখির ক্ষিপ্র গতিতে বনভূমির ডালপালা আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। বানরের দল অদ্ভুত শব্দ করে লাফাতে লাফাতে পালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই ঈগলের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। ধরে ফেলবে কাউকে–না–কাউকে। ঈগলের ধারালো নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নির্জীব হয়ে পড়বে বেচারা বানর। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে দু পায়ের বড়শির মতো নখের সাহায্যে ঈগল মৃতপ্রায় বানরকে নিয়ে উড়ে এসে বসবে গাছের মগডালে ডালপালায় তৈরি তার বিরাট বাসায়। আর আশ্চর্য হয়ে দেখতে হবে ঈগলের ছুরির মতো ধারালো ঠোঁটের সাহায্যে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বানরের মাংস খাবার দৃশ্য। এই হল আমাজানের বানরখেকো বহুশ্রুত হার্পি ঈগল। এই ধরনের ঈগল ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়াতেও দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ আবার এক ঝাঁক পাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যাবে। গাঢ় লাল, হলুদ, নীল এই পাখির রঙের বাহার দেখে মনে হবে এরা রূপকথার রাজ্য থেকে এসেছে। টিয়ার মতো ঠোঁট আর সুন্দর পালকের অপূর্ব লম্বা লেজের এই বড় আকারের হিরামন পাখিকে বলা হয় ম্যাকাও।

আর একদম ওপরে উঠে গেলে, মানে বনরাজির মাথার ওপর হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসবে। মনে হবে এত সূর্যালোক পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। পৃথিবীর এই সর্ববৃহৎ বনরাজ্যের সমস্ত শক্তির উৎস ও ভাণ্ডার হচ্ছে এই স্তর। এই স্তরের সৌরশক্তি গ্রহণ করেই গড়ে উঠেছে ১৫০ ফুট উঁচু হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত এই মহাবন। শত শত প্রজাতির গাছপালা, জন্তু–জানোয়ার আর লক্ষ জাতের কীটপতঙ্গ—সব কিছুর উৎস হচ্ছে ক্রান্তীয় এই সূর্যশক্তি।

চোখ ধাঁধানো কমে গেলে দেখা যাবে, দম–আটকানো স্যাঁতসেঁতে হাওয়ার বদলে ফুরফুরে হাওয়া বইছে এখানে থেকে থেকে। অবাক হয়ে দেখতে হবে বৃক্ষরাজির ঢেউ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে! এই বনের ব্রহ্মতালুর তেপান্তর মাঝে মাঝে ছোট টিলার মতো ওপরে উঠে গেছে। আবার সমতল এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর হয়ে মিলিয়ে গেছে দিগন্তে—গাঢ় হালকা সবুজের সুগহনে মাঝে মাঝে নীল, ফিকে লাল, বেগুনির ছাঁট মিলে একাকার হয়ে গেছে। কত বিচিত্র রং ও ধরনের ফুলে ফুলে সমুজ্জ্বল ! কোনো গাছে সারা বছরই কিছু–না–কিছু ফুটছে। কোনোটা দশ মাস আবার কোনোটা চোদ্দ মাস পর ফুলে ফুলে ভরে যায়। আবার কোনো কোনো গাছ আছে যারা এক দশক পর ফুলের মুখ দেখতে পায়। বনের মাথার এই ধূ–ধূ– প্রগাঢ় তেপান্তরের মাঠকে ছিন্ন করে মাঝে মাঝেই এক জাতের গাছের মাথা উঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসে আর তাদের পাতাহীন ডালপালা বছরে এক বার রাঙা ফুলে হয়ে যায় সুসজ্জিত—এরা হচ্ছে আমাজানের বিখ্যাত রাজবৃক্ষ মহাশিমুল। লম্বায় ২১০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ভাবতে অবাক লাগে মহাবনের এই ২০ থেকে ৩০ ফুট গভীর ওপরের তলায় কত না শত শত জাতের পাখপাখালি, পরগাছা, ছোট ছোট জন্তু আর হাজার রকমের কীটপতঙ্গ, প্রজাপতির বসবাস। এখানেই তাদের সারা বছরের খাবার সামগ্রী ফুল, ফল, পাতা, কীটপতঙ্গ যোগাড় হয়ে যায়। এখানেই তারা জন্মায়, ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়, বংশবৃদ্ধি করে আর শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—কখনও নিচের তলা দর্শন না করেই। এ শুধু সম্ভব আমাজানের মতো মহাবনেই।

এসব দেখা হয়ে গেলে বনানীর মাথার ছাউনি থেকে দড়ির সাহায্য না নিয়েও লিয়ানাম জাতীয় মোটা মোটা লতানো গাছ বেয়ে অনায়াসেই আবার মাটির ওপর নামা যায়। এই গহিন বন থেকে বেরোবার সময় নানা রঙে রঞ্জিত আমাজান আদিবাসীদের সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে। কারো কারো মাথা দুএকটা রঙিন পালকে সুশোভিত। লম্বা বাঁশের চোঙায় মুখ লাগিয়ে গভীর মনোযোগে কী যেন তারা লক্ষ করছে। নজর রাখছে হরিণের দিকে। সুযোগ পেলেই

চোঙায় ফুঁ দিয়ে নিঃশব্দে বিষ মাখানো তীর মারবে লক্ষ্যবস্তুর দিকে। লক্ষ্য তাদের অব্যর্থ। তীরের বিষ এরা যোগাড় করেছে বিষাক্ত লতাপাতা ও ব্যাঙের চামড়া থেকে। এমনি করেই এরা শিকার করে আহারের পাখপাখালি ও বন্য জন্তু–জানোয়ার।

ব্রাজিলবাসীরা বিশ্বাস করে এ বনরাজ্য মন্ত্রপূত, দৈব আর অবিনশ্বর। পৃথিবীর এই দৈবপূত সর্ববৃহত্তম বনরাজ্যকে কারও ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। আসলে একথা ঠিক নয়। মানুষের নির্বিচার আগ্রাসনে পৃথিবীর অন্যান্য অরণ্যের মতো আমাজানের এই মহাবনও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। তাদের করাল নিশ্বাসে দিন দিন স্তিমিত হয়ে পড়ছে এর প্রাণশক্তি, ঝলসে যাচ্ছে এর সবল অভ্যন্তর।

শব্দার্থ ও টীকা

ভেষজ — ওষুধ/ঔষধ।

আন্দেজ পর্বত — দক্ষিণ আমেরিকার এই পর্বতটি পানামা যোজক থেকে দক্ষিণে হর্ন অন্তরীপ পর্যন্ত ৬৪০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত।

নির্ঝঞ্ঝাট — ঝামেলামুক্ত।

পদসঞ্চার — পদক্ষেপ, পদচারণা।

জটাধারী — মাথায় জটাযুক্ত।

মন্ত্রপূত — যা মন্ত্র দিয়ে পবিত্র করা হয়েছে।

দৈব — দেবতার তৈরি।

অবিনশ্বর — যার কোনো বিনাশ বা ধ্বংস নেই।

অর্কিড — গুচ্ছ শিকড় ও উজ্জ্বল রঙের ফুলওয়ালা বিশেষ এক ধরনের পরগাছা (পাথর কিংবা গাছের ডাল আশ্রয় করে বেঁচে থাকে এগুলো)।

সৌরশক্তি — সূর্যের আলো ও উত্তাপ থেকে পাওয়া শক্তি।

ব্রহ্মতালু — মাথার তালু।

ব্রহ্মতালু তেপান্তর — চার পাশে বন অথচ মাঝ খানে বিশাল প্রান্তর—একে লেখক মাথার তালুর টাকের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

করাল — ভীষণ, ভয়ানক।

বোর্নিও — ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপ। এখানেও ঘন, বিশাল ও প্রাচীন বনভূমি আছে।

পাঠ–পরিচিতি

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও বিস্ময়কর বন হচ্ছে আমাজানের মহাবন। দক্ষিণ আমেরিকার নয়টি দেশ জুড়ে এর বিস্তার।

এই বিশাল বনরাজ্যে যে কত গাছপালা ও প্রাণী আছে, তার পুরোপুরি হদিস এখনও নির্ণীত হয়নি। এই বিশাল বনরাজ্যে এমন অনেক গহিন জায়গা আছে, যেখানে আজও মানুষের পদপাত ঘটেনি। এ অরণ্যে বড় বড় জীবজন্তু নেই। এটি নানা পোকামাকড়, ব্যাঙ, পিঁপড়া ও প্রজাপতিতে সমৃদ্ধ। আর আছে ভয়ংকর এক ধরনের কালো মাছি। এই বিশাল এলাকায় বসবাস করে মাত্র ৩০ লক্ষ লোক, যাদের মধ্যে রয়েছে ২ লক্ষ রেড ইন্ডিয়ান।

উড়ন্ত বিমান থেকে আমাজান অরণ্যকে দেখলে মনে হয় এটি যেন সবুজের মহাসাগর। কিন্তু গহিন জঙ্গলে ঢোকা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। সাহস করে একবার ঢুকলেও পথ খুঁজে বের হয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। ভরদুপুরেও সেখানে অন্ধকার। নানা পোকামাকড় ও পাখির গুঞ্জনে কলমুখর এ অরণ্য। বনের শুরুতে লতাপাতা গাছ বেশি। কিন্তু যত গহিনে প্রবেশ করা যায়, ততই ছোট ছোট গাছপালা কমে আসে। একেবারে গহিন বনে ভীষণ স্যাঁতসেঁতে মাটি আর অন্ধকার। সেখানে ঝোপঝাড় নেই। আছে লম্বা লম্বা গাছের গুঁড়ি।

মাটির ওপরে গাছের বড় বড় কাণ্ডগুলো মসৃণ ও প্রায় একরকম। কিন্তু ৫০ ফুট ওপরে নানা পরগাছা, মস, ফার্ন ইত্যাদি উদ্ভিদে গাছের কাণ্ড আবৃত।

এখানে দেখা যায় রংবেরঙের ছোট ছোট পাখি ও প্রজাপতি। পাওয়া যায় ফুলের মিষ্টি গন্ধ। ১০০ ফুট ওপরে রয়েছে নিবিড় ডালপালা ও পাতার জগৎ যা প্রায় ৩০ ফুট পুরু। পাখি ও পোকামাকড়ের কলগুঞ্জনে এ এলাকাটা মুখর। এখানেই রয়েছে পৃথিবীবিখ্যাত হামিং বার্ড। মৌমাছির মতোই তারা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। সব ঋতুতেই হাজার হাজার প্রজাতির ফুল ফোটে। এ ছাড়া দেখা যায় হাজার রকমের অর্কিড। বানরেরাও এখানে বসবাস করে। বানরখেকো বহুশ্রুত হার্পি ঈগলের শিকার হয় এসব বানর। আর রয়েছে 'ম্যাকাও' নামের হিরামন পাখি।

বনরাজির একেবারে মাথার ওপরে প্রচণ্ড আলোর ঝলকানি। এখানকার সৌরশক্তি গ্রহণ করে গড়ে উঠেছে ১৫০ ফুট উঁচু ও হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত এই মহাবন। এই বনেই রয়েছে আমাজানের বিখ্যাত রাজবৃক্ষ—মহাশিমুল। লম্বায় প্রায় ২১০ ফুট উঁচু। বনানীর মাথার ছাউনি থেকে লতানো গাছ বেয়ে নেমে আসা চলে মাটিতে।

এ গহিন বনের প্রান্তে বসবাস করে আদিবাসীরা। হরিণ, বন্য জন্তুজানোয়ার, পাখপাখালি শিকার করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে।

ব্রাজিলবাসীদের ধারণা এ বনরাজ্য মন্ত্রপূত। তাদের ধারণা এ বনরাজ্যকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কারও নেই। কিন্তু মানুষের করাল গ্রাসে এ মহাবন ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ছে।

লেখক–পরিচিতি

বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও পরিবেশবিজ্ঞানী নওয়াজেশ আহমেদ ১৯৩৬ সনে মানিকগঞ্জ জেলার পারিল নওয়াধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬০ সনে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'উদ্ভিদ বংশজাতি বিদ্যায়' পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

নওয়াজেশ আহমেদ মূলত সৃষ্টিশীল আলোকচিত্র শিল্পী। তা ছাড়া তিনি পরিবেশবিষয়ক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল : 'আহত কোকিল', 'মহা–বনস্পতির পদাবলী' ও 'বন বনানী'। তাঁর আলোকচিত্রবিষয়ক অ্যালবাম হচ্ছে 'বাস্তবের অন্বেষা' ও 'Bangladesh : Portrait of Bangladesh'.

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পিয়াম এক রকমের
   ক. ভয়ংকর মৌমাছি　　খ. কীটপতঙ্গ
   গ. ভয়ংকর কালো মাছি　　ঘ. কন্টকময় বৃক্ষ

২. আমাজান বনের বানরখেকো প্রাণীটির নাম
   ক. হার্পি ঈগল　　খ. ম্যাকাও
   গ. ঈগল　　ঘ. মহাশকুন

নিচের অংশটুকু পড়ে ৩-৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

গহিন বনাঞ্চলে ঢোকা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। সাহস করে একবার ঢুকলেও পথ খুঁজে বের হয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। ভরদুপুরেও সেখানে অন্ধকার। নানা পোকামাকড় ও পাখির গুঞ্জনে কলমুখর এ অরণ্য। বনের শুরুতে লতাপাতা গাছ বেশি। কিন্তু যত গহিনে প্রবেশ করা যায়, ততই ছোট ছোট গাছপালা কমে আসে। একেবারে গহীন বনে ভীষণ স্যাঁতসেঁতে মাটি আর অন্ধকার।

৩. ভরদুপুরেও সেখানে অন্ধকার কারণ সেখানে
i. সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না ii. সর্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে
iii. চোখ ঝাপসা হয়ে আসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. iii

৪. গহিন অরণ্য কখনো কখনো প্রাণবন্ত মনে হবার কারণ
ক. পশুপাখির অবাধ বিচরণ খ. উপজাতীয় জনগণের পদচারণা
গ. পর্যটকদের আনাগোনা ঘ. পোকামাকড় ও পাখির গুঞ্জন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. iii

৫. উদ্ধৃতাংশে গভীর অরণ্যের যে রূপ উপস্থাপিত হয়েছে তা
i. ভয়ংকর ii. উত্তেজনাকর
iii. বিভিষিকাময়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
বনরাজির একদম উপরে উঠে গেলে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসবে। মনে হবে এত সূর্যালোক আর কোথাও দেখা যায় না। পৃথিবীর এই সর্ববৃহৎ বনরাজ্যের সমস্ত শক্তির উৎস ও ভান্ডার হচ্ছে এই স্তর। এই স্তরের সৌরশক্তি গ্রহণ করেই গড়ে উঠেছে বিশাল এই মহাবন। শতশত প্রকৃতির গাছপালা জন্তু-জানোয়ার আর লক্ষ লক্ষ জাতের কীটপতঙ্গ সবকিছুর উৎস হচ্ছে ক্রান্তীয় এই সূর্যশক্তি।
ক. উদ্ধৃতাংশে কোন বনের কথা বলা হয়েছে?
খ. 'মনে হবে এত সূর্যালোক আর কোথাও দেখা যায় না' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
গ. বনভূমি দেশের অর্থনীতিতে কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে? উদ্ধৃতাংশের আলোকে উপস্থাপন কর।
ঘ. 'বনের শতশত প্রকৃতির গাছপালা ও জীবজন্তু এ সব কিছুর উৎস হচ্ছে ক্রান্তীয় এ সূর্যশক্তি'-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
হাঁটতে হাঁটতে আমরা আরো ভিতরের প্রবেশ করলাম। গভীর বন, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে তখন নানা প্রকার গাছপালা–কেওড়া সুন্দরী গোল পাতা ইত্যাদি। কীটপতঙ্গ, প্রচুর লাল কাঁকড়া, কালো কাঁকড়া, ভীমরুল, দেখা গেল হরিণের অবাধ বিচরণ। হঠাৎ চোখে পড়ল খালের ধারে পানি খাচ্ছে বিশাল এক ডোরাকাটা বাঘ। আবার দেখলাম একদল মানুষ মধু সংগ্রহ করছে মৌচাক থেকে। এদের বলা হয় বাওয়াল। এ আমাদের দেশেরই এক বনের চিত্র।
ক. বাওয়াল কারা? খ. উদ্ধৃতাংশে কোন বনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে?
গ. উদ্ধৃতাংশে চিত্রিত বনের সঙ্গে তোমার পঠিত 'মহাবন আমাজান' এর সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্ধৃতাংশের আলোকে একটি বড় বনের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

ডাক-হরকরা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



আজ সাত বৎসর দীনু ডাক–হরকরার কাজ করিতেছে; প্রত্যহ সে রাত্রে ডাক লইয়া যায়, লইয়া আসে; কিন্তু কোনো দিন তাহার এক মিনিট বিলম্ব হয় নাই। বরং সে বার পুল ভাঙিয়া এক দিন কলকাতার ডাকগাড়ি আসে নাই, এক দিন পথে মালগাড়ি ভাঙিয়া রাস্তা বন্ধ হওয়ায় পশ্চিমের ডাকগাড়ি আসিতে পাঁচ ঘণ্টা দেরি হইয়াছিল; কিন্তু দীনু ঠিক সময়ে যায়, ঠিক সময়ে আসে।

ডাকঘরে যখন দীনু পৌঁছিল, তখন ভোর হইয়াছে। ডাক নামাইয়া সে একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, উঃ বাজ যা আজ একটা পড়ল বাবু, সাণ্ডিন বাজ। বাপ রে বাপ! পোস্ট মাস্টার বলিল—ওঃ বিছানাতে থেকেই আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম রে দীনু।

দীনু বলিল, তামাক দেন কেনে একটুকু, সাজি এক বার। উঃ বড্ড কাঁপুনি লেগেছে মশায়।

অতঃপর পোস্ট মাস্টার ইনসিওর-রেজিস্ট্রি লইয়া বসিলেন, পিয়ন চিঠিগুলির উপর খট খট শব্দে ছাপ মারিতে আরম্ভ করিল, দীনু আপন মনে তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল। তাহার শীত করিতেছিল; কিন্তু উপায় নাই, ডাক না মিলিলে তাহার ছুটি হইবে না।

ইনসিওর-রেজিস্ট্রির কাজ শেষ হইয়া গেল। দীনুর এ বার ছুটি, সে বাড়ি চলিল।

পোস্ট মাস্টার বলিলেন, গরুটার ঘাস দিতে এত দেরি করিস কেন রে দীনু? একটু সকাল সকাল দিস।

ডাকবাবুর গরুর জন্য ঘাস দীনুকে দিতে হয়। তাই আনব।—বলিয়া দীনু চলিয়া গেল।

বাড়িতে আসিয়া দীনু স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল, নেতাই কোথা, মাঠে গেছে?

নিতাই দীনুর একমাত্র পুত্র। স্ত্রী বলিল, জানি না বাপু, সেই কাল সনজেতে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। সারা রাত আখড়াতে ঢোল বাজিয়ে সব চেঁচিয়েছে। দু বার আমি ডাকতে গেলাম তো আমাকে তেড়ে মারতে এল।

দীনু চিৎকার করিয়া উঠিল, মারবে !—বলিয়া সে কোদাল এবং ঘাস কাটিবার জন্য কাস্তে ও ঝুড়ি লইয়া মাঠে যাইতে উঠিয়া পড়িল।

স্ত্রী পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল—এই দেখ, কাণ্ডটা এক বার দেখ—খাওয়া নাই, কিছু নাই, বাবু চললেন রাগ করে! খেয়ে যাও বলচি। সারা রাত দৌড় দিয়ে হাঁটা—

ঘণ্টা দুয়েক পরে কর্দমাক্ত দেহে মাথার ঝুড়িতে এক বোঝা ঘাস ও আঁচলে এক আঁচল কই-মাগুর মাছ লইয়া সে বাড়ি ফিরিল। বাড়ির বাহির হইতে সে শুনিল, নিতাই বেশ উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া দিয়াছে।

মাছ পাইয়া দীনুর মেজাজ বেশ খুশি হইয়া উঠিয়াছিল। সে ছেলেকে কোনো কটু কথা বলিল না, ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমার কথার জবাব দে দেখি আগে, মাঠে যাস নাই কেনে শুনি ?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে নিতাই জবাব দিল, ধূ-রো, মাঠে গিয়ে কী হবে ? মাঠে গিয়ে কে কবে বড় লোক হয়েছে শুনি ?

দীনু অবাক হইয়া গেল।

নিতাইয়ের কথা তখনও শেষ হয় নাই। সে বলিতেছিল, এই এক রাশ ধান বেচলে একটা টাকা ! ধূ-রো, মাঠে গিয়ে কী হবে ?

নিতাইয়ের মা বলিল, ওরে লবাবের বেটা লবাব, খুব যে মুখে টাকা দেখাইছিস, বলি, একটা পয়সা কখনও এনেছিস তুই ?

নিতাই ট্যাক খুলিয়া ঠং করিয়া একটা টাকা ছুড়িয়া দিল—যেন নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু সেটা। তারপর বলিল, ওই লে, ফের যদি টিকটিক করবি তো বুঝতে পারবি।

মা তাহার কথায় অবাক হইয়া গেল। দীনু কিন্তু গম্ভীর স্বরে বলিল, তুই টাকা কোথায় পেলি রে নেতাই ? হি হি করিয়া হাসিয়া নিতাই উত্তর দিল, রাজারা মানিক কোথায় পায় ?

দীনু গম্ভীর স্বরে বলিল, হাসি-তামাশা লয় নেতাই। বল, তুই টাকা কোথা পেলি ?

নিতাই বিরক্তিভরে উঠিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, মর তুই ওই খানে বক বক করে, হ্যাঁ। দীনু উঠিয়া পিছন পিছন দুয়ার পর্যন্ত আসিয়া তাহাকে ডাকিল, নেতাই, শোন, শুনে যা, ফিরে আয় বলছি।

নিতাই তখন গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া আখড়ায় চলিয়াছে। দীনু ফিরিয়া আসিয়া দাওয়ার উপর অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। নিতাইয়ের ভাবগতিক তাহার বেশি ভালো লাগে না।

দীনু স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা নেতাই টাকা কোথা পেলে বলো দেখি ?

স্ত্রী বলিল, ভ্যালা মানুষ বাপু ! ওই নিয়ে তুমি ভাবতে বসলে ? বেটাছেলে, কোথাও হয়তো পেয়েছে।

দীনু কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না।

অপরাহ্ণে আহারের সময় পিতাপুত্রে আবার সাক্ষাৎ হইল। দীনু নিতাইয়ের আপাদমস্তক বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। দীনুর চোখ জুড়াইয়া গেল। ভরা-জোয়ান হইয়াছে নিতাই। সুন্দর সুগঠিত সবল দেহখানি কে যেন কালো পাথর কুঁদিয়া তৈয়ার করিয়াছে। সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা অস্থির চঞ্চলতা খেলা করিতেছে, মনে হয়, ইচ্ছা করিলে নিতাই আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে। দীনু পরিতুষ্ট চিত্তে স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরে বলিল, এই বার তো জোয়ান হয়েছিস নেতাই, এই বার একটা কাজকর্মে লেগে যা। ডাকঘরের কাজেই লেগে যা। লতুন ডাকঘর হচ্ছে আবার রামলগরে, এই ফাঁকে লেগে যা।

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ঢের লোক আছে তোর কাজ করবার। উ কাজ আমি লারব। বাবা, সারা পথ

ধুকুর-ধুকুর করে ছোটা, উ কি মানুষ পারে ?

নিতাইয়ের মা বলিল, কেনে, তোর বাবা পারে, আর তুই পারবি না কেনে ? তোর বাবা কি মানুষ লয়—নাকি ?

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, উ একটা আস্ত ভূত। লইলে হ্যাঁ—

দীনু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, লইলে কী ?

যাও যাও, বকো না বেশি তুমি। বুদ্ধি থাকলে বড় নোক হয়ে যেতে তুমি কোন দিন।

তার মানে ?

মানে আবার কী ? বললাম, তুমি ভেবে দেখ কেনে !

বলিয়া নিতাই হাত-মুখ ধুইয়া শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল।

দীনু নির্বাক স্তম্ভিত হইয়া তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। সে বল্লম, পেটি, মাথালি ও লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ঝুন ঝুন-ঠুন ঠুন। ডাক-হরকরা মৃদু তালে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। পথে এক দণ্ড বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, গতি শিথিল করিবার উপায় নাই, সামান্য বিলম্ব ঘটিলে কী হইবে, দীনু তাহা কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভয় হয়। তাহার উপর পথে কোথাও ওভারসিয়ার হয়তো লুকাইয়া আছে, কোনো জঙ্গালের মধ্যে কিংবা কোনো গাছের ডালে বসিয়া সে ডাক-হরকরার গতিবিধি লক্ষ করিতেছে। সামান্য একটু শৈথিল্য দেখিলেই রিপোর্ট করিয়া বসিবে। অমনি উপর হইতে জরিমানার হুকুম আসিয়া পড়িবে।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি, আজও আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। দীনুর হাতের আলোটা ধোঁয়ার কালিতে অন্ধচক্ষুর মতো জ্যোতিহীন পাণ্ডুর।

অন্ধকার বটবৃক্ষের তলদেশ হইতে একটি মানুষ আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইল। দীনু প্রশ্ন করিল, উপর স্যার বাবু ?

উত্তরে লাঠির আঘাতে তাহার লণ্ঠনটা চুরমার হইয়া গেল। মুহূর্তে দীনু ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া হাতের বল্লমটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, খবরদার, সরকারের ডাক।

এই দেখ, বস্তাটা দাও বলচি।

দীনুর হাতের বল্লমটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; সে বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল, কে—নেতাই ?

নিতাই বিপুল হিংস্রতায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

সহসা একটা আলোকরশ্মির আভাসে গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল। চমকাইয়া উঠিয়া নিতাই সেই দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। একটা ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল আলো অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে এবং আলোর প্রভায় স্থানটা ক্রমশ প্রদীপ্ততর হইয়া উঠিতেছে। সে এ বার শেষ চেষ্টা করিল, হাতের লাঠিটা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে দীনুর মাথায় বসাইয়া দিল। মুহূর্তে ফিনকি দিয়া কালো একটা তরলধারা ছুটিয়া বাহির হইয়া দীনুর মুখখানাকে বীভৎস করিয়া তুলিল। দীনু কাতরস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল—বাবা গো !

আলোটা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, নিতাই ব্যস্তভাবে আর এক বার ব্যাগটা ধরিয়া আকর্ষণ করিল; কিন্তু দীনুর জ্ঞান তখনও লুপ্ত হয় নাই, অগত্যা নিতাই ব্যাগটা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

দীনুর জ্ঞান হইলে সে দেখিল, প্রকাণ্ড একটা পাকা ঘরে একখানা লোহার খাটের উপর সে শুইয়া আছে; মাথায় ভয়ানক

যন্ত্রণা, কপালে হাত দিয়া অনুভব করিল, কাপড় দিয়া তাহার মাথাটা বাঁধিয়া দিয়াছে। তাহার খাটের পাশেও সারি সারি লোহার খাটে আরও কত লোক শুইয়া আছে। দীনু বুঝিল, এটা হাসপাতাল। সে পূর্বে কয়েক বার শহরে আসিয়া হাসপাতাল দেখিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে দীনুর সব মনে পড়িতে লাগিল।

কিছু পরেই পোস্ট-অপিসের সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব আসিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন, এই যে, জ্ঞান হয়েছে তোমার!

দীনু সাহেবকে চিনিত, কিন্তু এখন তাঁহার মুখপানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শুধু। সাহেব বলিলেন, খুব বাহাদুর তুমি। সরকার তোমার ওপর খুশি হয়েছেন। তুমি যে নিজের মাথা দিয়েও সরকারের ডাক বাঁচিয়েছ, এর জন্য তুমি রিওয়ার্ড, মানে পুরস্কার পাবে। সাহেব চলিয়া গেলেন।

তাহার পর আসিল পুলিশ। পুলিশের বড় সাহেব নিজে আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিন্তু ডাক সাহেবের মতো এত সহজে নিষ্কৃতি দিলেন না। তিনি বারবার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কাউকে তুমি চিনতে পারনি?

দীনু বিহ্বলের মতো চাহিয়া বলিল, হুজুর! আমার ছেলে নেতাই।

সাহেব বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন না। তবুও সামান্য বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না, বলিলেন—সে তোমার ছেলে?

উপরের দিকে মুখ তুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে দীনু বলিল, হ্যাঁ হুজুর।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

ডাক-হরকরা —	ডাকবাহক, চিঠিপত্র এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে নিয়ে যায় যে।
ডাকগাড়ি —	ডাক বহনকারী গাড়ি, ডাকের চিঠিপত্র, পার্সেল ইত্যাদি নিয়ে যায় যে-গাড়ি, মেলগাড়ি।
সাঙিন বাজ —	ভয়ানক বজ্রপাত।
ইনসিওর-রেজিস্ট্রি —	বীমাকৃত ও ডাকঘরে নিবন্ধনকৃত।
ডাক না মিলিলে —	ডাকের চিঠিপত্র তালিকা অনুযায়ী না মিললে।
সনজে (আঞ্চলিক উচ্চারণ) —	সাঁঝ, সন্ধ্যা।
আখড়া —	সাধনভজন, গানবাজনা ও ব্যায়াম ইত্যাদি অনুশীলনের জায়গা।
কর্দমাক্ত —	কাদাময়।
তাচ্ছিল্যভরে —	অবহেলার সঙ্গে, অবজ্ঞা দেখিয়ে।
লবাব —	নবাব।
ওই লে —	ওই নে।
ফের যদি টিকটিক করবি —	আবার যদি বকবক করিস, পেছনে লেগে থেকে বিরক্ত করিস। 'টিকটিক' কথাটি এখানে বিরক্তি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
লারব —	পারব না।
অপ্রসন্ন —	অসন্তুষ্ট, খুশি নয় এমন।
স্তম্ভিত —	অত্যন্ত বিস্ময়ে স্তব্ধ।
ওভারসিয়ার —	তত্ত্বাবধানকারী, পরিদর্শক।

প্রদীপ্ততর — উজ্জ্বলতর।
জ্যোতিহীন — দীপ্তিহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন।
সুপারিনটেনডেন্ট — দেখাশোনার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, তত্ত্বাবধায়ক।
পাণ্ডুর — বিবর্ণ, ফ্যাকাশে।
নিষ্কৃতি — নিস্তার, রক্ষা, অব্যাহতি।

পাঠ–পরিচিতি

'ডাক–হরকরা' গল্পে লেখক এক দিকে পুত্রস্নেহ অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠা—এই দুই হৃদয়বৃত্তির মধ্যে সংঘাতের অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন।

ডাক–হরকরা দীনু অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ। কলকাতার ডাকগাড়ি একাধিকবার বিলম্ব করেছে, কিন্তু ডাক আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে দীনুর কখনও দেরি হয় না।

দীনুর একমাত্র পুত্র নিতাই। তার চরিত্র পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘর–সংসারের কাজে সে সামান্যতম সহায়তা করার প্রয়োজন বোধ করে না। কোনোরকম দায়িত্বজ্ঞানও তার নেই। কোনো দিন হয়তো ঘরেই ফেরে না। মাঠের কাজ ফেলে আখড়াতে ঢোল বাজায় আর গান গায়। ফলে শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় দীনুকেই ফের মাঠের কাজে যেতে হয়।

এক দিন দীনু নিতাইয়ের কাছে মাঠে না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে নিতাই বিরক্তি প্রকাশ করে। অবজ্ঞাসূচক নানা মন্তব্যে সে বুঝিয়ে দেয় যে, এক রাশ ধান বেচে মাত্র এক টাকা পাওয়ার জন্য গতর খাটানোর ইচ্ছে তার নেই। তাচ্ছিল্যভরে সে ট্যাঁক থেকে এক টাকা ছুড়ে দেয়—যেন টাকা নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু, অতি সহজেই তা উপার্জন করা যায়। সন্ধ্যায় পিতাপুত্রে আবার দেখা হলে দীনু অত্যন্ত স্নেহভরে তার জোয়ান ছেলেকে ডাকঘরের কাজে লেগে যাওয়ার উপদেশ দেয়। কিন্তু নিতাই জানায়—সারা পথ ধুকুর–ধুকুর করে ছোটার মানুষ সে নয়। উপরন্তু, সে বাপকে শুনিয়ে দেয় যে, তার বাপটি নেহাত বোকা। না হলে এই কাজেও সে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতে পারত। কথা শুনে দীনু স্তম্ভিত হয়ে যায়।

শ্রাবণের এক রাতে দীনু ডাক নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ অন্ধকার বটগাছের তলা থেকে বের হয়ে এক জন তার পথ আটকাল। হাতের লাঠি দিয়ে তার লণ্ঠন চুরমার করে দিল। দীনু হাতের বল্লম উঠিয়ে তাকে বাধা দিল। এই সময় আক্রমণকারী তার কাছে এসে ডাকের বস্তা তুলে দেওয়ার জন্য কড়া আদেশ দিলে তার কণ্ঠ শুনে দীনু বুঝতে পারল, এ তার পুত্র নিতাই।

এমন সময় একটা উজ্জ্বল আলোকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে হিংস্র ও ক্ষিপ্ত নিতাই দীনুর মাথায় সজোরে লাঠির ঘা বসিয়ে দিল। মুহূর্তে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। দীনু কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। আলোটা কাছে আসার আগেই নিতাই শেষ চেষ্টা করল ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু দীনু তখনও জ্ঞান হারায়নি। শেষে ব্যর্থ নিতাই ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

জ্ঞান হলে দীনু দেখল সে হাসপাতালে। অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব এসে জানালেন, সরকার দীনুর ওপর খুব খুশি হয়েছেন। সরকারি ডাক বাঁচানোর জন্য তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এর পর এল পুলিশ। পুলিশ তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করতে লাগল। পুলিশ যখন জানতে চাইল কাউকে সে চিনতে পেরেছে কি না, হতবিহ্বল দীনু তখন নির্বিকারচিত্তে জানাল যে, আক্রমণকারী তারই পুত্র নিতাই।

পুত্রস্নেহের কাছে সত্যনিষ্ঠার জয় হল।

লেখক-পরিচিতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর জন্ম পশ্চিমবাংলার বীরভূমে, ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট। রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ ও ভয়ংকর প্রকৃতি এবং দরিদ্র, নিপীড়িত সাধারণ মানুষের জীবনকে তিনি তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

সাতান্নটি উপন্যাসসহ তাঁর মোট গ্রন্থের সংখ্যা একশ ত্রিশ। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে : 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'মন্বন্তর' ইত্যাদি।

সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'শরৎ স্মৃতি পুরস্কার', 'জগত্তারিণী স্মৃতি পদক', 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার', 'আকাদেমি পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছেন।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ডাক-হরকরার কাজ কোনটি—
   ক. সরকারি ডাক বহন করা খ. চিঠির উপর সিল দেয়া
   গ. চিঠি বাছাই করা ঘ. ডাকটিকিট বিক্রয় করা

নিচের অনুচ্ছেদটুকু পড় এবং ২-৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

প্রত্যহ সে রাত্রে ডাক লইয়া যায়, লইয়া আসে; কিন্তু কোনো দিন তাহার এক মিনিট বিলম্ব হয় নাই। বরং সে বার পুল ভাঙ্গিয়া একদিন কলকাতায় ডাকগাড়ি আসে নাই; এক দিন পথে মালগাড়ি ভাঙ্গিয়া রাস্তা বন্ধ হওয়ায় পশ্চিমের ডাকগাড়ি আসিতে পাঁচ ঘণ্টা দেরি হইয়াছিল; কিন্তু দীনু ঠিক সময়ে যায়, ঠিক সময়ে আসে।

২. উদ্ধৃতাংশ যে-গল্প থেকে লওয়া হয়েছে তার লেখক
   ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
   গ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ঘ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে দীনুর
   i. সততা
   ii. সময়ানুবর্তিতা
   iii. কর্তব্যনিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i খ. i ও ii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. দীনুর কাজের প্রতি তার কী মনোভাব লক্ষণীয়
   ক. শ্রদ্ধাশীল খ. অনিহা
   গ. উদাসীন ঘ. উৎসাহব্যাঞ্জক

৫. নিতাই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য
   i. লোভী ও স্বার্থপর
   ii. ত্যাগী ও সাহসী
   iii. কর্মঠ ও বেয়াড়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জ্ঞান ফিরলে দীনু দেখল সে হাসপাতালে। অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব এসে জানালেন, সরকার দীনুর উপর খুব খুশি হয়েছেন। সরকারি ডাক বাঁচাবার জন্য তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। এর পর পুলিশ এসে তাকে নানারূপ জেরা করল। জিজ্ঞাসা করল, সে কাউকে চিনতে পেরেছে কিনা, হতবিহ্বল দিনু তখন নির্বিকার চিত্তে জানাল যে, আক্রমণকারী তার পুত্র নিতাই। পুত্রস্নেহের কাছে সত্য নিষ্ঠার জয় হল।

ক. দীনুকে কেন হাসপাতালে আনা হয়েছিল?

খ. সরকার দীনুর প্রতি খুশি হবার কারণ বর্ণনা কর।

গ. দীনুর নিঃস্বার্থপরতা কীভাবে আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে—আলোচনা কর।

ঘ. উদ্ধৃতাংশের আলোকে দীনু চরিত্রের মাধুর্য বর্ণনা কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

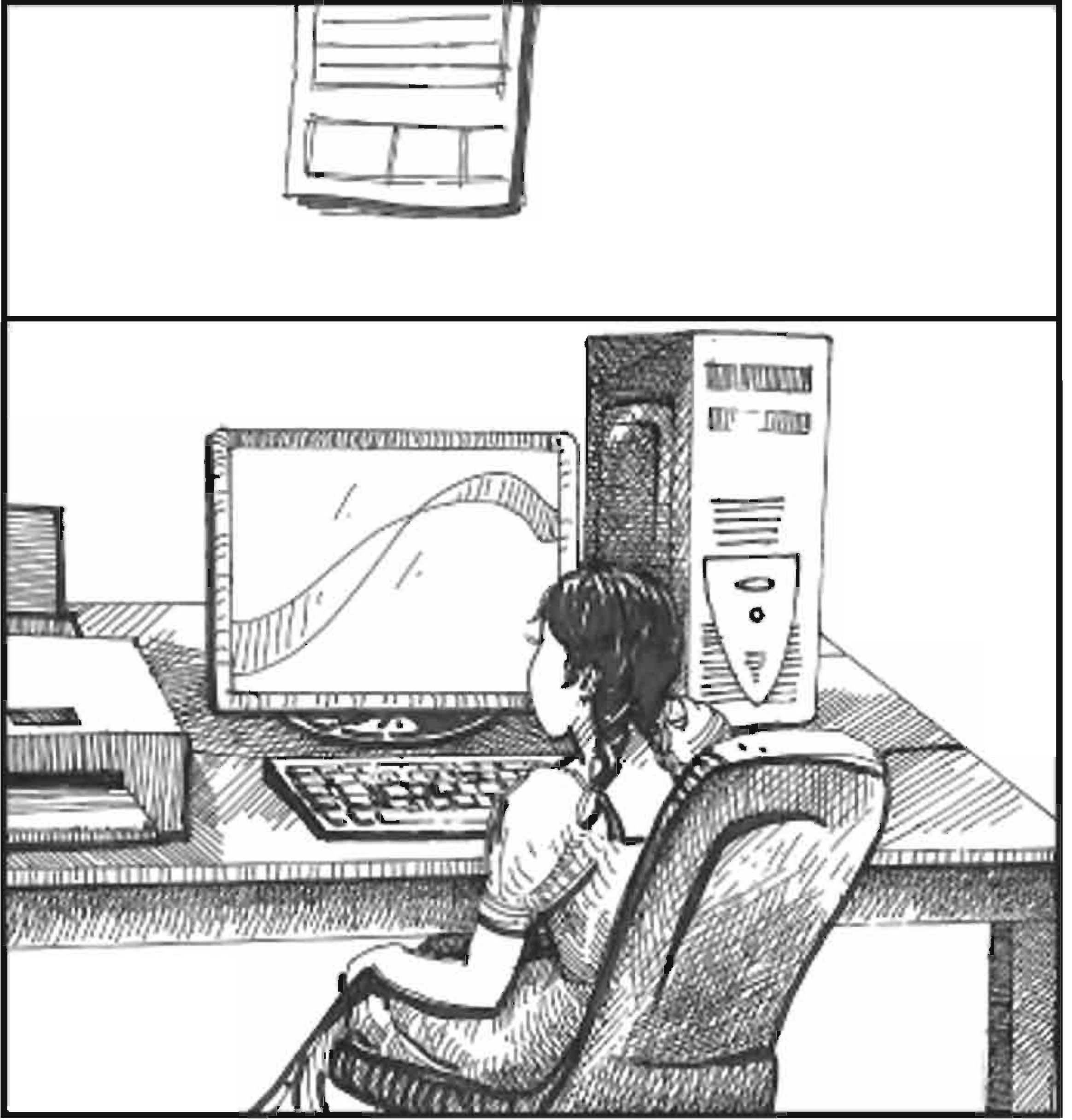
রহমান সাহেব ব্যাংকের একজন ক্যাশিয়ার। লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁর মাধ্যমে প্রতিদিন ব্যাংকে লেন-দেন হয়। ব্যাংকের লকারের চাবিও তাঁর তত্ত্বাবধানে। একরাত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যাংকে অবস্থান করেন। বিষয়টি তিনি ম্যানেজারকে অবগত করেন। গভীর রাত্রে একদল ডাকাত ব্যাংকের নৈশপ্রহরীকে গেটে হাত-পা বেঁধে ভিতরে প্রবেশ করে। তারা রহমান সাহেবকে লকারের চাবির জন্য ভীষণ মারধর করে। চাবি না পেয়ে তারা লকার ভাঙার চেষ্টা করে। রাত্রি ভোর হবার কারণে তারা চলে যায়। সকালে রহমান সাহেবকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় মেঝেতে পাওয়া যায়। ব্যাংকের টাকা বহাল তবিয়তে আছে বলে ম্যানেজার জানান। রহমান সাহেবের সততার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁকে পদোন্নতি দেয়।

ক. রহমান সাহেব সে রাত্রে কেন ব্যাংকে অবস্থান করেন?

খ. ডাকাতদের চাবি না দেওয়ায় রহমান সাহেবের কী লাভ বা ক্ষতি হয়েছে বর্ণনা কর।

গ. রহমান সাহেবের সততা থেকে কী শিক্ষা লাভ করা যায়—যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রহমান সাহেবের দায়িত্ববোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।



আমরা যদি কখনো কিছু লিখতে চাই তাহলে সবসময়েই হাতে একটা কলম বা পেন্সিল তুলে নিই। কলম বা পেন্সিল ছাড়া আমরা যে একেবারেই লিখতে পারব না তা নয়– এক টুকরো কয়লা দিয়েও আমরা লেখার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু তাহলে বড় জোর দুই একটা শব্দ লিখতে পারব, মোটেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যেতে পারব না। তাহলে বলা যেতে পারে ভালোভাবে লেখার জন্যে আমরা কলম কিংবা পেন্সিল নামে এক ধরনের ব্যবহারী যন্ত্র বা টুল (tool) আবিষ্কার করেছি। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে আমাদের জীবন সহজ করার জন্যে আমরা এরকম আরো অনেক টুল তৈরি করেছি। যেরকম, স্ক্রু লাগানোর জন্যে রয়েছে স্ক্রু ড্রাইভার। একটা কলম বা পেন্সিল দিয়ে স্ক্রু লাগানোও যায় না, খোলাও যায় না। প্লেটে খাবার তোলার জন্যে রয়েছে চামচ, কেউ কখনো স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে প্লেটে খাবার তুলতে পারবে না। সেলাই করার জন্যে রয়েছে সুঁই, চুল আচড়ানোর জন্যে রয়েছে চিরুনি। কেউ সুঁই দিয়ে চুল আচড়াতে পারবে না আবার চিরুনি দিয়ে সেলাই করতে পারবে না। কাজেই আমরা অনুমান করতে পারি আমাদের

জীবনকে সহজ করার জন্যে অসংখ্য টুল তৈরি হয়েছে–তবে মনে রাখতে হবে, একটা বিশেষ কাজের টুল দিয়ে কিন্তু অন্য কিছু করা যায় না, শুধু সেই কাজটাই করতে হয়।

এবারে আসল কথায় আসা যাক। আমরা সবাই কম্পিউটারের কথা শুনেছি–অনেকে কম্পিউটার দেখেছি কেউ ব্যবহারও করেছি, কিন্তু আমাদের অনেকের ভেতরেই কম্পিউটার জিনিসটা কী সেটা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। খুব সোজা করে বলা যায়, কলম, পেন্সিল, স্ক্রু ড্রাইভার, চামচ, সুঁই ও চিরুনির মতো কম্পিউটার হচ্ছে আমাদের কাজে সাহায্য করার জন্যে একটা টুল। সাথে সাথে সবার মনেই একটা প্রশ্ন জেগে উঠবে, এটা তাহলে কোন কাজের টুল? এটা দিয়ে কী কলমের মতো লেখা যায়? কিংবা রং তুলির মতো ছবি আঁকা যায়? অথবা ক্যাসেট প্লেয়ারের মতো গান শোনা যায়? এটা দিয়ে কী টেলিভিশনের মতো সিনেমা দেখা যায়? কিংবা ক্যালকুলেটরের মতো হিসেবে করা যায়? টেলিফোনের মতো কথা বলা যায়? এটা দিয়ে কী যন্ত্রপাতি চালানো যায়? মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

মজার এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার হচ্ছে কম্পিউটার দিয়ে উপরের প্রত্যেকটা কাজ করা যায়। শুধু যে উপরের কাজগুলো করা যায় তা নয়– এর বাইরেও অসংখ্য কাজ করা যায়। সত্যি কথা বলতে কী, কম্পিউটার দিয়ে কী কী কাজ করা যাবে তার কোনো বাধাধরা নিয়ম নেই। একজন মানুষ যতো সৃজনশীল সে কম্পিউটারকে ব্যবহার করার ততো নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করতে পারবে। প্রথমে কম্পিউটার তৈরী হয়েছিলো 'কম্পিউট' (compute) বা হিসেবে–নিকেশ করার জন্যে, তারপর সেটা ব্যবহার হতে শুরু করেছে ব্যবসায়িক কাজে। এখন সেটা ব্যবহার হচ্ছে শিল্প সাহিত্য এবং বিনোদনে।

স্ক্রু ড্রাইভার একটা টুল আবার কম্পিউটারও একটা টুল, কিন্তু স্ক্রু ড্রাইভারের ওপর মোট মোটা বই লেখা হয় নি কম্পিউটারের ওপর লেখা হয়েছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ক্রু ড্রাইভারের ওপর আলাদা বিভাগ নেই কিন্তু কম্পিউটারের ওপর বিভাগ আছে। এর কারণ এটা অন্য রকম টুল। এটা দিয়ে শুধু একটা বিশেষ কাজ করতে হয় না– এটা দিয়ে দৈনন্দিন কাজ থেকে শুরু করে, প্রাতিষ্ঠানিক কাজ, শিক্ষা–গবেষণা, চিকিৎসা সবকিছু করা যায়। এটা মানুষকে শুধু তার কাজ করতে সাহায্য করে না, তার কাজ করার ক্ষমতা, চিন্তা করার ক্ষমতাকেও শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। বহুদিন পর মানুষ তার জীবন সত্যিকারভাবে অর্থপূর্ণ করার জন্যে একটা পরিপূর্ণ টুল পেয়েছে। এটা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় কম্পিউটার দিয়ে এখন যে সব করা হচ্ছে ভবিষ্যতে তার বাইরেও আমরা আরো অনেক ধরনের কাজ করতে দেখব, যেটা এখন আমরা কল্পনাও করতে পারছি না!

কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে সবার ভেতরেই একটা কৌতূহল আছে। জটিল ইলেকট্রনিক খুঁটিনাটি বোঝা হয়তো সহজ নয় কিন্তু মূল বিষয়টা বোঝা খুব সহজ। কম্পিউটার তৈরি হয়েছে (ক) নির্দেশ গ্রহণ করার জন্যে এবং (খ) সেই নির্দেশ অনুযায়ী একটা কাজ করার জন্যে। একটা কম্পিউটার ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলো নির্দেশ নিতে পারে আবার প্রত্যেকটা নির্দেশের জন্যে একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। আলাদাভাবে প্রত্যেকটা নির্দেশই খুবই সহজ,

তার জন্যে যে কাজ করতে হবে সেটাও খুব সহজ। কিন্তু সেই সহজ নির্দেশ যখন লক্ষ লক্ষটি সাজানো হয় এবং কম্পিউটার সেই লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট কাজ একটার পর একটা করে ফেলে তখন সেটি হয়ে যায় চমকপ্রদ একটা কাজ। কম্পিউটারের নির্দেশগুলো সাজানোর নাম হচ্ছে প্রোগ্রামিং করা। প্রোগ্রামিং করার বিষয়টা অনেক সহজ করে দেয়া হয়েছে। তাই কাউকে প্রোগ্রামিং করতে হলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, বিশেষ বিশেষ কাজ করার প্রোগ্রামগুলো এর মাঝে নানাভাবে তৈরি হয়ে আছে। তাই কেউ যদি কম্পিউটার ব্যবহার করে লিখতে চায় তাহলে তাকে নতুন করে লেখালেখির প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয় না যেটা তৈরি আছে সেটাই ব্যবহার করে লেখালেখি শুরু করতে পারবে। শুধু লেখালেখি নয়, ছবি আঁকা, গান শোনা, ছবি দেখা, হিসেব করা–এরকম দৈনন্দিন সব কাজের প্রোগ্রামই তৈরি করা আছে, তাই একজন কম্পিউটারের কিছু না জেনেই সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।

জ্ঞান–বিজ্ঞানে মানুষের উন্নতির ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে বলে অনেকের ভেতরে কম্পিউটার সম্পর্কে একটা অতিরঞ্জিত ধারণা আছে। অনেকেই মনে করেন, কম্পিউটারের বুঝি মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা আছে কিংবা তাদের ক্ষমতা মানুষ থেকে বেশি। এটি কিন্তু সত্যি নয়। একথা সত্যি তিরিশ অঙ্কের একটা সংখ্যাকে আরেকটা তিরিশ অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে দিলে সেটা বের করতে একজন মানুষের অনেক সময় লাগবে, কিন্তু একটা কম্পিউটার মুহূর্তের মধ্যে সেটা সঠিকভাবে করে ফেলবে। একটা মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কি খুশি না বিষণ্ন সেটি একটা ছোট বাচ্চাও মুহূর্তের মাঝে বলে দিবে–পৃথিবীর সেরা কম্পিউটারগুলো কিন্তু সেটা বলতে পারবে না।

কম্পিউটারকে এখনো মানুষের মস্তিষ্কের কাছাকাছি ভাবা হয় না সেটা সত্যি, কিন্তু তার যতটুকু গুরুত্ব পাওয়ার কথা সেটা ঠিকই দেয়া হয়। 'চার রংয়ের সমস্যা' নামে গণিতের একটা সমস্যা বহুদিন থেকে মানুষ সমাধান করতে পারছিলো না। সমস্যাটা বোঝা খুব সহজ : আমরা যখন পৃথিবীর মানচিত্র আঁকি তখন পাশাপাশি দুটো দেশ যেন কখনোই এক রংয়ের না হয় সেটা নিশ্চিত করতে কমপক্ষে কতোগুলো রং ব্যবহার করতে হবে? সঠিক উত্তর হচ্ছে চার, কিন্তু এটা বের করতে গণিতবিদদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হয়েছে। পৃথিবীর গণিতবিদরা অনেকদিন চিন্তা ভাবনা করেছিলেন, কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে করা একটি প্রমাণকে তারা সঠিক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করবেন কিনা। শেষ পর্যন্ত তারা প্রমাণটি গ্রহণ করেছেন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত গণিতবিদদের পাশে প্রথম বারের মতো কম্পিউটারকে জায়গা দিতে হয়েছে।

ভবিষ্যতে আমরা এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেখব। কম্পিউটার আরো অনেক উন্নত হবে, কে জানে ভবিষ্যতে একদিন হয়তো কম্পিউটার মানুষের বুদ্ধিমত্তার কাছাকাছি চলে আসবে। আমরা আশা করছি, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সেই চমকপ্রদ রহস্যময় জগতে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরাও একদিন অংশ নেবে।

আমরা পৃথিবী থেকে শুধু নেবো না, আমরা পৃথিবীকে কিছু দেবোও!

শব্দার্থ ও টীকা

ক্যাসেট প্লেয়ার – গান শোনার একধরনের যন্ত্র।

ক্যালকুলেটর – হাতে ধরে রেখে হিসেব করার ছোট যন্ত্র।

সৃজনশীল – নতুন সৃষ্টি করায় সক্ষম এমন।

গণিতবিদ – গনিত বিষয়ে অনেক কিছু জানেন যিনি।

পাঠ–পরিচিতি

বর্তমান পৃথিবীতে যে যন্ত্রটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা হচ্ছে কম্পিউটার। তার কারণ এটি শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার না করে সম্ভাব্য অনেক কাজে ব্যবহার করা যায়। পৃথিবীতে উন্নয়নে কম্পিউটার এতো বড় প্রভাব ফেলেছে বলে অনেক মানুষেরই এটি সম্পর্কে একটু অতিরঞ্জিত মনোভাব রয়েছে। "সবার জন্যে কম্পিউটার" লেখাটিতে একটি কম্পিউটার সত্যিকার অর্থে আমাদের জীবনে কতোটুকু প্রভাব ফেলতে পারে সেটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

মুহম্মদ জাফর ইকবালের জন্ম ১৯৫২ সালে সিলেট শহরে। তাঁর গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ আঠারো বছর থেকে তিনি দেশে ফিরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যোগ দেন। তিনি শিশু কিশোরদের জন্যে লেখালেখি করেন। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার জন্যে তাঁকে ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'আমি তপু', 'বৃষ্টির ঠিকানা', 'প্রোজেক্ট নেবুলা', 'নিঃসঙ্গ গ্রহচারী', 'নিতু ও তার বন্ধুরা', 'ক্রমিয়াম অরণ্য' ও 'দীপু নম্বর টু' উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্ক্রু ড্রাইভার ও কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য কী?

ক. স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে কম্পিউটার খোলা যায়।

খ). কম্পিউটার দিয়ে স্ক্রু ড্রাইভারের ছবি আঁকা যায়।

গ. স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে শুধু একটি কাজ এবং কম্পিউটার দিয়ে অনেক কাজ করা যায়।

ঘ. স্ক্রু ড্রাইভারের উপর বই লেখা হয় না, কম্পিউটারের ওপর বই লেখা হয়।

২. কম্পিউটার ব্যবহার করে কী কী কাজ করা যায়?

ক. ছবি আঁকা যায়

খ. লেখালেখি করা যায়

গ. সৃজনশীল মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কী কী করা যায় সেটা নির্ধারণ করতে পারে

ঘ. মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. কম্পিউটারকে দিয়ে কাজ করানোর জন্যে কী করতে হয়?

ক. প্রোগ্রামিং করতে হয়

খ. মৌখিক নির্দেশ দিতে হয়

গ. লিখিত নির্দেশ দিতে হয়

ঘ. কিছুই করতে হয় না।

৪. গণিতের কোন সূত্রটি প্রমাণ করার জন্যে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়?

ক. ফার্মার শেষ থিওরেম

খ. চার রংয়ের সমস্যা

গ. তিন রংয়ের সমস্যা

ঘ. মানচিত্র আঁকার সমস্যা।

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

মতিঝিল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব লুৎফর রহমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা অনেকে কম্পিউটারের কথা শুনেছ, দেখেছ এবং ব্যবহারও করেছ। এ যন্ত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল তৈরিতে কাজের লাগে, তাছাড়া ব্যবসায়িক কাজকর্ম, শিল্প সাহিত্য, বিনোদন, ছবি আঁকা, গান শুনার ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেক বড় বড় গাণিতিক সমস্যা যা তোমাদের সমাধান করতে বেশি সময় লাগবে কিন্তু কম্পিউটার অল্প সময়ে তার সঠিক সমাধান দিয়ে দেবে। কম্পিউটার ভবিষ্যতে একদিন মানুষের বুদ্ধিমত্তার কাছে চলে আসবে। আমি আশা করছি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চমকপ্রদ রহস্যময় জগতে তোমরা একদিন অংশ নেবে।

ক. কম্পিউটার কী?

খ. কম্পিউটারের একটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দাও।

গ. উক্ত বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল তৈরিতে কম্পিউটার কী ভূমিকা রাখতে পারে? বর্ণনা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক চমকপ্রদ রহস্যময় জগত"–কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।



আকাশ জয়ের কাহিনী

একটা গল্প আছে যে, প্রাচীন গ্রিস দেশে দাইদ্যলুস নামে এক বিখ্যাত মিস্ত্রি ও তার ছেলে আইকারুস বাস করত।

একদা ক্রিট সফরকালে রাজা মাইনস তাদের দুই জনকে বন্দি করে জেলে প্রেরণ করেন। বিশাল সমুদ্রের ওপর দিয়ে পালাবার পথ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দাইদ্যলুসের মাথায় এক বুদ্ধি খেলে। দাইদ্যলুস তার ও তার ছেলের জন্য মোম দিয়ে পাখা তৈরি করল, এই পাখা লাগিয়ে ক্রিট থেকে সিসিলিতে উড়ে যাওয়ার ফন্দি করল ওরা। দাইদ্যলুস নিরাপদেই সিসিলিতে অবতরণ করল; কিন্তু আইকারুস উড়তে উড়তে সূর্যের এত কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, সেখানে যাওয়ার পর তার পাখা দুটো সূর্যতাপে গলে গেল, আর সে নিপতিত হল সাগরের বুকে।

এমনি কল্পনা মানুষ প্রত্যেক যুগেই করেছে। কারণ, আকাশের অসীমে উড়ে বেড়ানোর আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরকালের। আকাশে উড়ে বেড়াবার স্বপ্ন সার্থক হওয়ার জন্য মন্টগলফিয়ার ভ্রাতাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। ফ্রান্সের ছোট শহর অ্যাননিতে ছিল তাঁদের কাগজের কারখানা। কিন্তু তাঁদের আকর্ষণ কেবল কাগজের কলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

এক দিন আগুনের সামনে বসে বসে জোসেফ তাঁর ভাইকে বললেন : 'স্টিফেন, ভাবছিলাম, ধোঁয়া যখন এমন তীব্র গতিতে ওপরে ওঠে, তখন নিশ্চয় সঙ্গে করে কিছু একটা ওপরে নিয়ে উঠতে পারবে।'

মুহূর্তকাল স্টিফেন নীরব হয়ে রইলেন। তারপর বললেন : 'আমরা যদি এক খণ্ড মেঘ ধরে একটা থলেতে আবদ্ধ করে রাখতে পারতাম, তা হলে থলেটা আকাশে ভেসে বেড়াতে পারত। সেটা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। মেঘের কাছে আমরা পৌঁছব কী করে? তবে আমরা কী করতে পারি, তা বলছি। চল, আমরা চিমনির ধোঁয়া একটি থলেতে ভরতে চেষ্টা করি।'

পরবর্তী ছ মাসে তাঁরা ধোঁয়া ধরবার থলে তৈরি করলেন। অবশ্যি ব্যাপারটা গোপন রাখা হল। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, পাড়া-প্রতিবেশীরা কথাটা শুনতে পেলে হাসবে। বলবে, এমন বোকামি আর হয় না। থলেটা তৈরি করা হয়েছিল সিল্কের কাপড় দিয়ে। নিচের দিকটা ইচ্ছা করেই খোলা রাখা হয়েছিল।

১৭৮২ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি তাঁরা তাদের বিরাট পরীক্ষাকার্যের জন্য তৈরি হলেন। থলেটির খোলা মুখটিতে জোসেফ মন্টগলফিয়ার কিছু প্রজ্বলিত কাগজ রাখলেন। থলেতে ধোঁয়া প্রবেশ করল। ধোঁয়ায় থলেটা পূর্ণ হওয়ার পর সেটা ঘরের সিলিং অবধি উঠে গেল। স্টিফেন আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন : 'ধোঁয়ার সাহায্যে থলে ওপরে উঠতে পারে। চল, আমরা উন্মুক্ত আকাশে পরীক্ষা চালিয়ে দেখি।'

থলেটি সত্তর ফুট ওপরে উঠল। আবার যখন নিচে নেমে এল, তখন বেশ ধীরে ধীরেই নেমে এল। জোসেফ ও স্টিফেনের আনন্দ দেখে কে ?

এই অদ্ভুত খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দুই ভাই ঠিক করলেন, বিরাট একটি থলে তৈরি করে সবাইকে তাঁদের আবিষ্কারে তাক লাগিয়ে দেবেন। বহু লোক এসে জমায়েত হল। তাঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবধি ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্টিফেন ও জোসেফের বেলুন যখন ছ হাজার ফুট উঁচু অবধি উঠল তখন তাঁদের বিস্ময় দেখে কে ?

খবরটা যখন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পৌঁছল, তখন সেখানকার বিজ্ঞানীরা ভ্রাতৃদ্বয়কে আমন্ত্রণ করে নিলেন সেখানে। সেখানে তাঁদের এই আবিষ্কারের পরীক্ষা দিতে হবে। প্যারির সেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন। বেলুনটি যখন ওপরে উঠতে লাগল, তাঁরা সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে রইলেন।

অবশেষে ফ্রান্সের সম্রাটও এই অদ্ভুত আবিষ্কারটি দেখতে চাইলেন। আবার বেলুন উড়ল আকাশে। এবার এতে যাত্রীও ছিল—একটি ভেড়া, একটি খরগোশ ও একটি পাতিহাঁস।

॥ দুই ॥

স্বপ্নবিলাসী আরও ছিলেন। 'পাখিরা যদি বাতাসে উড়ে বেড়াতে পারে, আমরা পারব না কেন?' কিন্তু এই ভাবনায় দুঃসাহসীদের অনেকেরই প্রাণ নষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু জার্মানির পোমেরেনিয়র অটো লিলিয়েনথেল এতে নিরুৎসাহ বোধ করেননি। তিনি সুদীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে পাখির ওড়া সম্পর্কে পরীক্ষা চালালেন। পাখি যখন উড়তে শুরু করে, তখন সেটা ওপরের দিকে উঠে আবার যখন নামে, তখন পাখা দুটো কীভাবে থাকে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি পরীক্ষা করলেন। শত শত চিত্র আঁকলেন তিনি। পাখি সম্পর্কে এমন পরীক্ষা কেউ কখনো করেননি কোনো দিন। অবশেষে কুড়ি বছর পর লিলিয়েনথেল একটি যন্ত্রআবিষ্কার করলেন। এবার আর গ্যাসের দরকার নেই।

১৮৯১ সালে পৃথিবী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। মানুষ দেখতে পেল দুটো বিরাট পাখার সাহায্যে আকাশের বুকে মানুষ উড়ছে। দাইদ্যলুসের রূপকথা বাস্তবে পরিণত হল। লিলিয়েনথেল বললেন : 'মানুষ উড়তে পারে। শুধু প্রয়োজন অভ্যাসের।' লিলিয়েনথেল দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই অভ্যাসের অনুশীলন করলেন, হাজার হাজার বার তিনি আকাশে উড়লেন, অবশেষে তিনি স্থির করলেন পাখায় একটি মোটর বসানো হবে। তাই করা হল। তারপর এক গ্রীষ্মের দিনে তিনি আকাশে উড়লেন। সকলে নিরুদ্ধ-শ্বাসে তাঁকে দেখতে লাগল। তিনি দ্রুত ওপরে উঠতে লাগলেন। হঠাৎ এক শব্দ। তারপর বাতাসে একটা অস্পষ্ট করুণ ধ্বনি। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়ই। সত্যি তাই, আইকারুসের মত লিলিয়েনথেলও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

॥ তিন ॥

ওহিওর ডেয়টনস্থ রাইট সাইকেল কোম্পানিতে হকার রোজকার মতো সংবাদপত্র রেখে গেল। ধূসর চোখ ও লম্বা নাকবিশিষ্ট বিরাট দেহ উইলবার রাইট সংবাদপত্রটিতে চোখ বুলিয়েই তাঁর ছোট ভাই অরভিলের দিক চেয়ে বললেন : 'এ কী! যে লোকটা উড়ত সে মারা গেছে'। অরভিল কাজ ছেড়ে চোখ তুলে তাকালেন। উইলবার পড়তে লাগলেন: 'বার্লিন, ১২ই আগস্ট, ইঞ্জিনিয়ার হের অটো লিলিয়েনথেল—যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আকাশে উড়বার যন্ত্র আবিষ্কার সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন—এক দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।'

দুই ভাই লিলিয়েনথেলের কাহিনীতে জমে গেলেন। তাঁরা এত বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, লিলিয়েনথেলের রচিত পুস্তকটির জন্য তাঁরা বার্লিনে লিখে বসলেন। যথাসময়ে বই এল। তাঁরা নিরাশ হলেন, বই যে জার্মান ভাষায় লেখা। তাঁরা কেবল ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু শিগগিরই তাঁরা জার্মান ভাষা শিখে ফেললেন। অন্তত বইটি ভালো করে বুঝবার মতো জার্মান ভাষা তাঁরা আয়ত্ত করলেন। লিলিয়েনথেলের মৃত্যুর পর থেকে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের সাইকেলের ব্যবসা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। ওড়ার কল্পনা তাঁদের পেয়ে বসল। প্রায় পাঁচ বছর ধরে তাঁরা পাখির ওড়ার কৌশল পর্যবেক্ষণ করলেন। পাহাড়ের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে তাঁরা পাখিগুলোকে লক্ষ করতেন আর তর্ক করতেন। দুই ভাই সর্বাধিক বিপজ্জনক কল্পনায় এমনি করে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। দুই ভাই-ই ছিলেন অত্যন্ত ভালো মিস্ত্রি।

॥ চার ॥

এক দিন এক প্রবীণ লোক রাইটভ্রাতাদের পরীক্ষা পরিচালনার মাঠে এসে হাজির হয়ে দেখতে পেলেন যে, দুই ভাই প্রজাপতির মতো এক বার উড়ছে ও এক বার নামছে, যেন লাফাচ্ছে। তিনি অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন। ওড়ার যন্ত্রটাও তিনি নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করলেন। তিনি বললেন : 'তোমরা কি বুঝতে পারছ যে উড়বার চেষ্টা এ পর্যন্ত যাঁরাই করে এসেছেন, তাঁদের সবার চেয়ে তোমাদের কৃতকার্যতা অনেকখানি বেশি?'

এই বৃদ্ধ ছিলেন অকটেভ সনিউট। উড়বার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ। তিনি উড়বার যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। সনিউট তাঁদের খুব উৎসাহ দিলেন আর রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ও অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ করতে লাগলেন।

১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের আবিষ্কারের পরীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রস্তুত হয়েছেন। কিটি হক ও নর্থ কেরোলিনার লোকজনের নিকট আমন্ত্রণ প্রেরণ করা হল। লোকজন জানত, এই ডিসেম্বরের তীব্র শীতে আকাশে ওড়া দেখতে যাওয়া বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। আকাশে আবার মানুষ ওড়ে কী করে? মাত্র পাঁচ জন লোক সেখানে সমবেত হল।

যন্ত্রটি উড়বার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর ইঞ্জিনটি তাঁদেরই তৈরি। অরভিল রাইট যন্ত্রের ভেতর গিয়ে বসলেন। অবাক কাণ্ড! এরোপ্লেন আকাশে উড়ল। বারো সেকেন্ড থাকল আকাশে। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একটি এরোপ্লেন এক জন মানুষকে নিয়ে আকাশে উড়ল এবং আবার নির্বিঘ্নে ভূমিতে অবতরণ করল।

অবশেষে আজ আর পাখির প্রতি মানুষকে ঈর্ষান্বিত হতে হয় না। যে-কোনো দ্রুতগামী পাখির চেয়ে মানুষ আজ দ্রুততর গতিতে আকাশে উড়তে পারে।

(সংকলিত)

শব্দার্থ ও টীকা

নিপতিত— নিচে পড়েছে এমন।

মন্টগলফিয়ার— যোশেফ মন্টগলফিয়ার ও স্টিফেন মন্টগলফিয়ার। এঁরা দুই ভাই আকাশে ওড়ার প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা ও উদ্যোক্তা।

স্বপ্নবিলাসী— স্বপ্ন ও কল্পনায় বিভোর এমন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০)— বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক ও বিজ্ঞানী।

পাঠ–পরিচিতি

আকাশে ওড়ার জন্য মানুষের সুদীর্ঘকালের প্রচেস্টা কীভাবে সার্থক হয়—তাই বর্ণিত হয়েছে 'আকাশজয়ের কাহিনী' রচনায়।

সুপ্রাচীন কাল থেকে আকাশে ওড়া নিয়ে নানারকম কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রিসে প্রচলিত একটি গল্প এ রকম: দাইদ্যলুস নামে এক বিখ্যাত মিস্ত্রি ও তাঁর ছেলে আইকারুসকে বন্দি করে রেখেছিলেন রাজা মাইনস। জেল থেকে পালাবার প্রচেষ্টায় সমুদ্র পার হওয়ার জন্য দাইদ্যলুস তাঁর নিজের ও ছেলের জন্য মোম দিয়ে পাখা তৈরি করেন। মিস্ত্রি মোমের পাখা দিয়ে নিরাপদে অবতরণ করলেও ছেলে উড়তে উড়তে চলে যায় সূর্যের কাছাকাছি। ফলে পাখা গলে সে পড়ে যায় সাগরের বুকে। এই কল্পকাহিনীই এক দিন মন্টগলফিয়ার ভ্রাতাদের উদ্বুদ্ধ করে ওড়ার স্বপ্নকে সার্থক করতে। দু ভাই জোসেফ ও স্টিফেন ধোঁয়াকে তীব্র গতিতে ওপরে উঠতে দেখে এবং মেঘকে ভেসে বেড়াতে দেখে ভাবলেন, এই মেঘকে আর ধোঁয়াকে থলেতে ভরে ছেড়ে দিলে ভেসে বেড়াবে। কিন্তু মেঘকে তো থলেতে ভরা সম্ভব নয়। তাই ছ মাস গোপনে চেস্টা করে তাঁরা ধোঁয়াকে ধরবার জন্য থলে তৈরি করেন। ১৭৮২ সালে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় তাঁরা তাদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেন। তৈরী থলের মুখে কাগজ জ্বালিয়ে তার ধোঁয়ায় থলে পূর্ণ করে ছেড়ে দেন। দেখা গেল থলে ঘরের সিলিং অবধি উঠে গেছে। এরপর তাঁরা খোলা মাঠে গিয়ে পরীক্ষা চালান।

পরীক্ষা চালিয়ে কৃতকার্য হলে তাঁদের নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের ডাক পড়ে প্যারিতে। প্যারির বিজ্ঞানীরা তাঁদের আবিষ্কারটি দেখতে চাইলে আবার বেলুন উড়ল আকাশে। এরপর আবার ফ্রান্সের সম্রাটকে দেখানোর জন্যও বেলুন উড়ল। তবে সেবার যাত্রী হল কয়েকটি জন্তু।

এই ধরনের স্বপ্নবিলাসী মানুষ আরও ছিলেন। পাখিকে আকাশে ডানা মেলে উড়তে দেখে বহু দুঃসাহসী মানুষ নানাভাবে উড়বার চেস্টা চালাতে গিয়ে প্রাণ হারান। এরকম এক জন হচ্ছেন জার্মানির ইঞ্জিনিয়ার লিলিয়েনথেল। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে তিনি পাখির ওড়া সম্পর্কে পরীক্ষা চালান। পাখি নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে লিলিয়েনথেল একটি বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে ১৮৯১ সালে তিনিই সর্বপ্রথম আকাশের বুকে ওড়েন।

লিলিয়েনথেলের ধারণা ছিল, মানুষও অভ্যাস করলে উড়তে পারে। তাই দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি আকাশে ওড়ার অনুশীলন করেন। অবশেষে তিনি তাঁর পাখায় একটি মোটর বসিয়ে আকাশে উড়লেন। সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাঁকে দেখতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ কিছু যান্ত্রিক গোলমাল হয়ে গেলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাইট সাইকেল কোম্পানির দুই ভাই উইলবার ও অরভিল সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারেন যে লিলিয়েনথেল মারা গেছেন। ওড়ার জন্য লিলিয়েনথেলের সাফল্যজনক প্রচেস্টা আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিঘ্নিত হতে দেখে তাঁদের পেয়ে বসল আকাশে ওড়ার কল্পনা। তাঁরা লিলিয়েনথেলের লেখা পুস্তক সংগ্রহ করে আনলেন জার্মানি থেকে। জার্মান ভাষায় লেখা বইটি পড়ার জন্য জার্মান ভাষাও শিখলেন তাঁরা।

পড়ে রইল সাইকেলের ব্যবসা। তাঁরাও দীর্ঘ পাঁচ বছর পাখিদের ওড়ার কৌশল পর্যবেক্ষণ করলেন। মগ্ন হলেন নানারকম বিপজ্জনক কাজের কল্পনায়। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় শুরু করলেন ওড়ার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তা দেখে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ উড়বার যন্ত্রবিশেষজ্ঞ অকটেভ সনিউট তাঁদেরকে উৎসাহ দিলেন। তিনি জানালেন, এত দিন যাঁরা এ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন, তাঁদের চেয়ে রাইট ভ্রাতাদের কৃতকার্যতা অনেক বেশি। সনিউটের উৎসাহে তাঁরা আরও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকেন। ফলে ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের নবআবিষ্কারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই প্রথম একটি যন্ত্র মানুষসহ আকাশে উড়ল এবং নির্বিঘ্নে মাটিতে নেমে এল।

[সংকলিত]

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ফ্রান্সের অ্যাননিতে জোসেফ–স্টিফেনদের কারখানায় তৈরি করা হত—
   - ক. বেলুন
   - খ. কাগজ
   - গ. মোম
   - ঘ. সিল্কের কাপড়

২. রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের জার্মান ভাষা শেখার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল—
   - ক. লিলিয়েনথেলের পুস্তকটি পড়া
   - খ. জার্মানিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করা
   - গ. লিলিয়েনথেলের জীবন সম্পর্কে জানা
   - ঘ. জার্মান ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করা

৩. 'মানুষ উড়তে পারে। শুধু প্রয়োজন অভ্যাসের।' লিলিয়েনথেলের একথার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে–
   - ক. আশা
   - খ. দুরাশা
   - গ. বিশ্বাস
   - ঘ. হতাশা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

"১৭৮২ সালের সেই খবরটা যখন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পৌঁছল, তখন সেখানকার বিজ্ঞানীরা জোসেফ ও স্টিফেনকে আমন্ত্রণ করে নিলেন সেখানে। সেখানে তাঁদের এই আবিষ্কারের পরীক্ষা দিতে হবে। প্যারিসের সেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন। বেলুনটি যখন ওপরে উঠতে লাগল, তাঁরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে রইলেন।"

   - ক. জোসেফ ও স্টিফেনকে কারা আমন্ত্রণ জানাল?
   - খ. ১৭৮২ সালে অ্যাননিতে জোসেফ–স্টিফেন ভ্রাতৃদ্বয় সে বিস্ময়কর খবর সৃষ্টি করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধর।
   - গ. জোসেফ–স্টিফেন–এর ধোঁয়ার ফলে আবিষ্কার জাহাজ আবিষ্কারের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত যুক্তি সহকারে উপস্থাপন কর।
   - ঘ. ধোঁয়ার বেলুন আবিষ্কার রাইটভ্রাতৃদ্বয়ের উড়োজাহাজ আবিষ্কারের অনুপ্রেরণাস্বরূপ—তুমি কি এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের আবিষ্কারের পরীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রস্তুত হয়েছেন। লোকজনের নিকট আমন্ত্রণ পাঠানো হল। কিন্তু মাত্র পাঁচজন লোক সেখানে সমবেত হল। অরভিল রাইট যন্ত্রের ভেতর গিয়ে বসলেন। এরোপ্লেন আকাশে উড়ল। বারো সেকেন্ড পর আবার নির্বিঘ্নে তা মাটিতে নেমে এল। ইতিহাসে এই প্রথম একটি মানুষ আকাশে উড়ল।

ক. প্রথম আকাশে উড়ল কোন মানবসন্তান?

খ. ১৭ই ডিসেম্বর এত লোক আমন্ত্রিত হলেও মাত্র পাঁচ জন লোক সেখানে সমবেত হওয়ার কারণ বর্ণনা কর।

গ. উড়োজাহাজ আবিষ্কার সভ্যতার কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে তা উপস্থাপন কর।

ঘ. আধুনিক সভ্যতায় রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের অবদানের একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা কর।



হাতে নিয়ে আলোকবর্তিকা

মাহবুবুল হক

প্রায় দেড়শ বছর আগের কথা। ইতিহাসবিখ্যাত ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। টাইমস পত্রিকার বিখ্যাত সামরিক সংবাদদাতা উইলিয়াম রাসেল দার্দানেলিসের তীরে ব্রিটিশ সৈন্যশিবিরে গিয়ে দেখতে পেলেন—অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অব্যবস্থার মধ্যে, চিকিৎসাসেবার অভাবে, দলে দলে সৈনিক যুদ্ধ শুরুর আগেই প্রাণ হারাচ্ছে। তিনি সেখানকার পরিস্থিতির হৃদয়বিদারক বর্ণনাশেষে আবেদন আকারে লিখলেন : ইংল্যান্ডে কি এমন নারী বা কন্যাসন্তান নেই, যারা স্কুটারি হাসপাতালের রুগ্‌ণ ও আহত সেনাদের সেবা-শুশ্রূষায় যেতে ইচ্ছুক ও সক্ষম? ফ্রান্স অকাতরে মানবতার সেবিকাদের পাঠাচ্ছে আর আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গে আমরা ফরাসিদের এত পেছনে পড়ে থাকব?

রাসেলের আবেদন বৃথা গেল না। কয়েক দিনের মধ্যেই শত শত ইংরেজ নারী নার্স হিসেবে স্কুটারি যাওয়ার আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন ব্রিটিশ সদর দফতরে। এ সমস্ত ইংরেজ নারীর মধ্যে আগ্রহ ও আবেগের ঘাটতি ছিল না। ছিল একটিমাত্র জিনিসের অভাব—যোগ্যতা। তাদের না ছিল প্রশিক্ষণ, না ছিল হাসপাতালে কাজের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা।

সমর বিভাগের সচিব সিডনি হার্বার্ট তাঁর টেবিলে আসা স্তূপীকৃত চিঠি একের পর এক পড়লেন। কিন্তু সব চিঠিই শুভেচ্ছা-প্রণোদিত আবেগ উন্মাদনায় ভরা, কিন্তু প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এক জনকেও খুঁজে পেলেন না তিনি। সুতরাং কোনো আবেদনপত্রই কাজে এল না।

তবে কি ইংল্যান্ডে এমন এক জন নারীও নেই যার এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণের দৃঢ় মনোবল ও যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ রয়েছে?

সিডনি হার্বার্টের কিন্তু এমন এক জনের কথা জানা ছিল। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা, কয়েক বছর নার্সিং সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং এ ধরনের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও তাঁর আছে।

কে এই মহিলা?

তাঁর নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। তাঁর জন্ম ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে। প্রিয় ফ্লোরেন্স শহরে জন্ম বলেই পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন ফ্লোরেন্স। তিনি গণিত, কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষা, সংগীত ও সেলাই শিখে দেশে-বিদেশে ঘোরেন। তারপর অভিভাবকদের আপত্তির মুখে অবিবাহিত থেকে আর্তপীড়িতদের সেবায় জীবন কাটাবার সিদ্ধান্ত নেন। হাতে-কলমে নার্সিং শেখেন জার্মানিতে। প্যারিস ও স্কটল্যান্ডে শেখেন হাসপাতাল পরিচালনার কাজ।

সে সময়ে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের কারও জন্য নার্সিং-এর পেশা সম্মানজনক বলে গণ্য করা হত না। ১৮৪৯ সালে ডার্বিশায়ারের ধনী ইংরেজের দ্বিতীয় কন্যা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যখন কাইযারওয়ার্থের ডিকনেস হাসপাতালে নার্স-এর কাজ করতে এলেন, তখন সেখানকার সেবিকা হিসেবে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁরা সবাই ছিলেন সাধারণ কৃষকদের

কন্যা। তাঁরা অবাক ও বিস্মিত হলেন। কিছুতেই তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না, ধনসম্পদ ও উঁচু বংশমর্যাদার অধিকারী এক জন ইংরেজ মহিলা কেন দামি পোশাক ও রত্ন অলংকার ছেড়ে এ পেশায় এলেন? কেন নীল পোশাক, সাদা অ্যাপ্রন আর মসলিনের টুপির ইউনিফরম বেছে নিলেন ? তাঁরা ভাবলেন, এই মহিলা হয়তো এসেছেন শখ করে; দু–চার দিনের মধ্যেই আবার ফিরে যাবেন নিজের জায়গায়। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে তাঁরা দেখলেন, ফ্লোরেন্স সত্যি সত্যিই এসেছেন সেবিকার কাজ করতে।

ডিকনেস হাসপাতালের শিক্ষাশেষে ফ্লোরেন্স অস্ত্রোপচার সম্পর্কে পড়াশোনা করলেন। লন্ডন, এডিনবার্গ, ডাবলিন শহরের ও বিদেশের রাজধানী শহরের চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করলেন। এর সাথে ফরাসিদের চিকিৎসাব্যবস্থার তুলনা করে শেষে লন্ডনে একটি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেন। অব্যবস্থার জন্য সেটির অবস্থা হয়ে পড়েছিল খুবই শোচনীয়। কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রমে তিনি এটির অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হন। কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখনই ছাপা হয় সাংবাদিক রাসেলের চিঠি।

অসুস্থ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যখন সাংবাদিক রাসেলের আবেদনে সাড়া দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময়ই তিনি পেলেন সমর সচিবের একটি চিঠি। সমস্ত পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে সমর সচিব ১৫ অক্টোবর তাঁকে চিঠিতে লিখলেন : আমি যত দূর জানি, সমগ্র ইংল্যান্ডে এক জন মহিলাই আছেন যিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে স্কুটারি হাসপাতালে সেবাকাজের পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিতে সক্ষম। আপনি কি এ দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন?

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সঙ্গে সঙ্গে সমর সচিবকে জানিয়ে দিলেন তাঁর সম্মতির কথা।

২১শে অক্টোবর সন্ধ্যায়, অ্যাঞ্জেল ব্যান্ড জাহাজ লন্ডন ত্যাগ করল ৩৮ জন নার্স নিয়ে। ঐ নার্সদলের তত্ত্বাবধানে রইলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা–শুশ্রূষার জন্য সম্ভ্রান্ত এক জন ইংরেজ মহিলার এগিয়ে আসার সংবাদ গোটা ইংল্যান্ডে আলোড়ন তুলল। লন্ডনের সবার মুখে মুখে তখন একটিমাত্র জিজ্ঞাসা : কে এই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ?

২৫শে অক্টোবর জাহাজ পৌঁছল মাল্টায়। সেখান থেকে তাঁরা জাহাজ বদল করে ৪ঠা নভেম্বর পৌঁছলেন স্কুটারিতে।

স্কুটারির সামরিক হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল বসফরাস প্রণালীর তীরে এক পাহাড়ের ওপর। হাসপাতালটি ছিল বিশাল চারকোনা ভবনে। তার গ্যালারি ও করিডোরগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় চার মাইল, মাঝখানের বিরাট হলঘরে ১২ হাজার লোক জমায়েত হতে পারত। ফ্লোরেন্স যখন এই হাসপাতালে পৌঁছলেন, তখন অগণিত করিডোরে ডানে–বামে এলোপাথাড়িভাবে পড়ে ছিল অসংখ্য আহত সৈন্য। তখন হাসপাতালে না ছিল পানির পাত্র, থালাবাসন, সাবান–তোয়ালে, না ছিল কম্বল ও ব্যান্ডেজের কাপড়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসারিত হওয়ার পর কয়েক দিন হয়ে গেলেও এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। আহত সৈন্যদের স্থান অনাবৃত। অনেকেই পড়ে আছে দূষিত নোংরা বেডে। তার ওপর পোকা-মাকড় আর ইঁদুরের উৎপাতে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ।

৪ঠা নভেম্বরে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল তখন পর্যন্ত জানা ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত হাতাহাতি লড়াই। ফলে আগে থেকে যারা আহত হয়ে পড়েছিল, তাদের দিকে সেবার হাত বাড়ানোর আগেই কয়েক দিনের মধ্যে দলে দলে আহত সৈন্য আসতে লাগল এবং সেই বিশাল আয়তনের হাসপাতালের প্রতি ইঞ্চি জায়গা ভরে গেল।

সেই মারাত্মক পরিস্থিতি মোকাবেলায় এগিয়ে এলেন ফ্লোরেন্স। মহাপরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে দিনে ২০ ঘণ্টা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে লাগলেন। এক দিকে আহতদের ব্যবস্থাপনা, স্থান বণ্টন, নার্সদের ডিউটি নির্ধারণ; অন্য দিকে কয়েক মাইল ব্যাপী গ্যালারি ও করিডোরে স্থান নেওয়া অসংখ্য আহতের কাছে চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়া, গুরুতর অস্ত্রোপচারের সময় ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকা, নোংরা অপরিসর রান্নাঘরে শৃঙ্খলা আনা। এ ছাড়াও অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে প্রথম ৩ মাসে নিজের ও বন্ধুবান্ধবদের তরফ থেকে ১০ হাজার শার্ট সংগ্রহ করে রুগ্‌ণ লোকদের মধ্যে বিতরণ করেছেন তিনি। 'টাইমস' পত্রিকার তহবিল দিয়ে সপ্তাহে পাঁচশ জামা ধোয়ার মতো বিরাট গামলা বসানো হল।

তাঁর কর্মপরিচালনার গুণে নার্সরাও বিনা কাজে সময় কাটাতেন না। রোগীর সেবার পর বাকি সময় তাদের করতে হত ব্যান্ডেজ কাটা, তালিকা তৈরি, ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্য পাতলা তক্তা কাটা এবং মাদুর ও ক্যানভাস সেলাইয়ের কাজ।

এক সময় সৈনিকদের মধ্যে মহামারী আকারে কলেরা দেখা দিলে আক্রান্ত সৈনিকরা আশ্রয় নিতে থাকে স্কুটারি হাসপাতালে। তখন তাদের বাঁচানোর সর্বাত্মক সংগ্রামও করতে হয়েছে ফ্লোরেন্সকে। এই ঘোরতর সংকটময় অবস্থায়ও তিনি মনোবল হারাননি। সারা দিনের একটানা খাটুনির পর তিনি আলো–হাতে অসংখ্য গ্যালারির এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায় যন্ত্রণাকাতর বিনিদ্র রোগীদের দেখতে গিয়েছেন। তাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন, মুমূর্ষু রোগীদের জবানবন্দি নিয়েছেন। এই সেবাব্রতী ভূমিকার জন্যেই তিনি পরিচিত হয়েছেন 'আলো–হাতে মহিলা' নামে।

এমনিভাবে তিনি প্রায় দু বছর সেখানে সেবাব্রতীর ভূমিকা পালন করেন। তাঁর স্বাস্থ্য এত ভেঙে পড়ে যে, তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়। ব্রিটিশ সরকার দেশে ফেরার জন্য তাঁর সম্মানে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর প্রস্তাব করলে তিনি রাজি হননি। ছদ্মনাম নিয়ে সবার অলক্ষে বেসরকারিভাবে তিনি ইংল্যান্ডে ফেরেন।

সমগ্র ইংল্যান্ডে তখন তাঁর নাম উচ্চারিত হচ্ছে ঘরে ঘরে, গভীর শ্রদ্ধাভরে। আর তিনি তখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং ভবিষ্যৎ নার্সিং আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেন—সক্রিয়ভাবে তাঁর পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব হবে না।

এবার ভিন্ন পথে শুরু হল তাঁর সক্রিয়তা। হাসপাতাল পরিচালনা ও নার্সিং বিষয়ে বই লিখলেন তিনি। লিখলেন অনেক ছোট ছোট পুস্তিকা। নার্সিং সম্পর্কে লেখা তাঁর 'কোচ' বইটি এক লক্ষেরও বেশি কপি বিক্রি হল।

প্রচলিত প্রথা ভেঙে নারীদের পেশা হিসেবে সেবিকার বৃত্তিটিকে তিনি যে সম্মানিত করলেন, এজন্যে কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে সম্মানিত করতে চাইল। দেশবাসী পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড চাঁদা তুলে দিলেন তাঁর হাতে। সেই অর্থে ১৮৫৯ সালে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হল ইংল্যান্ডের প্রথম নার্সিং স্কুল।

জীবনের শেষ দিকে তিনি নানা সম্মানে ভূষিত হলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে পেলেন রেড ক্রস। ১৯০৭ সালে তিনি ভূষিত হলেন 'অর্ডার অব মেরিট' সম্মানে। এই বিরল ও সবচেয়ে মূল্যবান সম্মানের অধিকারী প্রথম মহিলা তিনিই।

তবে সবচেয়ে বড় সম্মান তিনি পেয়েছেন তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে। সশ্রদ্ধ এবং অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

এক দিন স্কুটারি হাসপাতালে যে আলো হাতে করে তিনি ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ডে হেঁটেছেন, গিয়েছেন প্রতিটি আহত ও রুগ্ণ মানুষের পাশে, সেবার সেই আলোকরশ্মি আজ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। আজ বিশ্বের যে–কোনো খানে, যে–কোনো সেবিকার দিকে তাকালেই মনে পড়ে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা, যিনি এ ক্ষেত্রে পুরোধা ও প্রেরণা হয়ে আছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ— ১৮৫৩ সালে এই যুদ্ধ শুরু হয় রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে বিবাদের পরিণতি হিসেবে। পরে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ এই যুদ্ধে যোগ দেয়।

প্রণোদিত— উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত।

নার্সিং— রোগীর পরিচর্যাবৃত্তি, সেবিকাবৃত্তি।

অ্যাপ্রন— মূল পোশাকের ওপরে আবরণ হিসেবে ব্যবহৃত ঢিলা পোশাক।

ইউনিফরম— ছাত্রছাত্রী, পুলিশ, সেনাবাহিনীর লোকদের ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট পোশাক, উর্দি।

বসফরাস প্রণালী— কৃষ্ণসাগর ও মরমর সাগরের মধ্যবর্তী ২৭ কি.মি. দীর্ঘ প্রণালী।

দুর্বিষহ— সহ্য করা কঠিন এমন, অসহনীয়, দুঃসহ।

ডিউটি— করণীয় কাজ, দায়িত্ব, কর্মভার।

অস্ত্রোপচার— চিকিৎসার জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ, অপারেশন।

অপরিসর— সরু, অপ্রশস্ত, কম চওড়া।

ক্যানভাস— এক ধরনের মজবুত মোটা কাপড়।

সর্বাত্মক— সম্পূর্ণ।

মুমূর্ষু— মরণাপন্ন, মৃতপ্রায়।

সেবাব্রতী— সেবাকে যে ব্রত হিসেবে নিয়েছে।

করিডোর— স্বতন্ত্র ঘরের সঙ্গে যোগাযোগকারী পথ।

গ্যালারি— সারিবদ্ধ আসনবিশিষ্ট তাক বা তলা, প্রদর্শনের তাক।

পাঠ–পরিচিতি

'হাতে নিয়ে আলোকবর্তিকা' রচনায় আধুনিক নার্সিং–এর পথিকৃৎ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সেবাব্রতী ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন মানবতার সেবায় নিবেদিত একজন ইংরেজ নার্স।

প্রায় দেড়শ বছর আগে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত ও যুদ্ধাহত সেনাদের সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবের সংবাদে ইংল্যান্ডে আলোড়ন ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। বিখ্যাত সাংবাদিক উইলিয়াম রাসেল আবেদন জানালেন—যেন স্বেচ্ছাব্রতী ইংরেজ মহিলারা এগিয়ে আসেন সেখানে সেবাব্রতী ভূমিকা পালনের জন্য।

এই আহ্বানে সাড়া দিলেন অসংখ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইংরেজ নারী। কিন্তু দেখা গেল তেমন যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ নেই। সমর সচিব সিডনি হার্বার্ট এক জনের কথা জানতেন যিনি শিক্ষা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য। এই মহিলা হলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

তাঁর জন্ম ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে। গণিত, বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা, সংগীত ও সেলাই শেখার পর তিনি আর্তপীড়িতদের সেবায় ব্রতী হন। জার্মানিতে তিনি নার্সিং শেখেন। প্যারিস ও স্কটল্যান্ডে শেখেন হাসপাতাল পরিচালনার কাজ।

সেই সময় নার্সিং–এর পেশা সম্মানজনক ছিল না। কিন্তু ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ডিকনেস হাসপাতালে নার্সিং–এর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন যুদ্ধাহতদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার কথা ভাবছিলেন, তখনই তাঁর কাছে সমর সচিবের আমন্ত্রণ এল। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ৩৮ জন নার্স নিয়ে স্কুটারি হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হন।

সেই বিশাল হাসপাতালের বহুসংখ্যক গ্যালারি ও করিডোর তখন রুগ্ণ ও আহত অসংখ্য রোগীতে সমাকীর্ণ। প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও চিকিৎসাসেবার উপকরণের অভাব তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা। পরিবেশও ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সেই মারাত্মক পরিস্থিতিতে দৈনিক প্রায় ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করে সবার কাছে সেবার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তিনি হাসপাতাল পরিচালনায় অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন। রাতে একাকী দীপ হাতে যন্ত্রণাকাতর বিনিদ্র রোগীদের পাশে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন, গুরুতর অস্ত্রোপচারের সময় পাশে দাঁড়িয়েছেন মমতা নিয়ে। এই সেবাব্রতী ভূমিকার জন্য তিনি পরিচিত হয়েছেন 'আলো–হাতে মহিলা' নামে।

প্রায় দু বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অসুস্থতা নিয়ে তিনি সবার অলক্ষে দেশে ফিরে আসেন। সমগ্র ইংল্যান্ডে তাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হতে থাকে। দেশবাসীর অর্থসহায়তায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ইংল্যান্ডের প্রথম নার্সিং স্কুল। জীবনের শেষ পর্যায়ে কর্ম ও অবদানের জন্য তিনি ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অর্ডার অব মেরিট'–এ ভূষিত হন।

আলো–হাতে সেবিকার প্রতীক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মেয়েদের নার্সিং–এর অন্যতম পথিকৃৎ ও মানবসেবার উজ্জ্বল প্রেরণা হয়ে আছেন।

লেখক–পরিচিতি

ড. মাহবুবুল হক 'বাংলা বানানের নিয়ম' গ্রন্থ লিখে দেশ–বিদেশের গুণীজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত 'পাঠ্য বইয়ের বানান' পুস্তকের তিনি অন্যতম সম্পাদক। বাংলা একাডেমীর বানান অভিধান প্রণয়নের কাজেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

মাহবুবুল হক বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক অনুবাদগ্রন্থ হচ্ছে 'মৌমাছি ও মানুষ' এবং বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর অনুবাদ 'টাইম মেশিন'। বিদ্যালয়ের সহপাঠ গ্রন্থসহ তাঁর উল্লেখযোগ্য কিশোর–পাঠ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'গল্প কথার আল্পনা', 'গল্পগাথা', 'পাঠ্য বইয়ে বাংলা বানানের নিয়ম'। ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য বই 'চারুপাঠ'–এর সংকলকও তিনি। নজরুল বিষয়ক তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ 'গল্পে গল্পে নজরুল'।

ড. মাহবুবুল হক–এর জন্ম ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে, ফরিদপুর জেলার মধুখালিতে। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্কুটারি যাওয়ার জন্য যেসব ইংরেজ নারী আবেদন করেছিল তাদের অভাব ছিল—

ক. যথাযথ আগ্রহ
খ. প্রয়োজনীয় আবেগ
গ. যথাযথ প্রশিক্ষণ
ঘ. প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

২. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল জন্ম গ্রহণ করেন কোথায়?

ক. ফ্রান্স
খ. জার্মানে
গ. ইংল্যান্ডে
ঘ. ইতালিতে

৩. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল হাতে-কলমে নার্সিং শেখেন—

ক. জার্মানিতে
খ. ইতালিতে
গ. স্কটল্যান্ডে
ঘ. ইংল্যান্ডে

৪. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যখন কাইযারওয়ার্থের ডিকনেস হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করতে এলেন, তখন সেখানে কর্মরত সেবিকারা অবাক ও বিস্মিত হলেন কারণ তাঁরা সকলে ছিলেন—

i. গরিব
ii. সাধারণ কৃষকদের কন্যা
iii. অশিক্ষিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

প্রায় দেড়শ বছর আগে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গোল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত দৈনিকদের সেবা করার জন্য ইংল্যান্ডের স্কুটারির সামরিক হাসপাতালে যোগদান করেছিলেন। আহত রোগীদের সেবায় অনন্য অবদান রাখার জন্য তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'আলো–হাতে মহিলা' নামে। আহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া, গুরুতর অস্ত্রোপচারের সময় উপস্থিত থাকা, নোংরা রান্নাঘরে শৃঙ্খলা আনা, ব্যান্ডেজ কাটা, তালিকা তৈরি, মাদুর ও ক্যানভাস সেলাইয়ের কাজও করতে হয়েছে তাঁর দলের সদস্যদের। এ সবই হয়েছে তাঁর তত্ত্বাবধানে। একবার মহামারী আকারে কলেরা দেখা দিলে তিনি রোগীদের এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায় বিনিদ্র রোগীদের দেখতে গিয়েছিলেন, তাদের সেবা করেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন। আর্ত মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে সারা পৃথিবীতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তিনি।

ক. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গোল কে ছিলেন?
খ. স্কুটারি হাসপাতালে নাইটিঙ্গোলকে কী কী কাজ করতে হয়েছে বর্ণনা কর।
গ. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গোলকে 'আলো–হাতে মহিলা' নাম দেওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গোলের সেবামূলক কাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রচলিত প্রথা ভেঙে সেবিকার বৃত্তিকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গোল পৃথিবীতে সম্মানের আসনে নিয়ে আসেন। এজন্য কৃতজ্ঞ দেশবাসীর প্রদত্ত অর্থসহায়তায় তিনি ইংল্যান্ডে প্রথম নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি নানা সম্মানে ভূষিত হন। তার মধ্যে অন্যতম ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অর্ডার অব মেরিট'। ভারতীয় উপমহাদেশে এরকম আর একজন মানবসেবী মাদার তেরেসা সকলের মন জয় করেছেন। কুষ্ঠ রোগীর সেবায় তিনি স্থাপন করেছিলেন হাসপাতাল, যা আজও মানবসেবায় অবদান রেখে চলেছে।

ক. মাদার তেরেসা কোন রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
খ. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গোলকে ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অর্ডার অব মেরিট' এ ভূষিত করা হয় কেন?
গ. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গোলের কর্মজীবনের কোন কোন দিকগুলো তোমাকে অনুপ্রাণিত করে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মাদার তেরেসা ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গোলের সেবামূলক কাজের একটি তুলনামূলক বিবরণ দাও।

একটি অনন্য পুরাকীর্তি

আ. কা. মো. যাকারিয়া



খুলনা পৌঁছে সেখান থেকে গাড়ি বদল করে আলতাফ সাহেব ছেলেদের নিয়ে চললেন বাগেরহাটের দিকে। বাগেরহাটে নেমে সেখান থেকে রিকশা করে প্রায় ৫ মাইল দূরে ষাট গম্বুজ মসজিদে যেতে হল। ষাট গম্বুজ মসজিদের কাছেই আছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি রেস্ট হাউস। তিনি আগে থেকেই সেখানে থাকার অনুমতি নিয়েছিলেন। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

পরদিন সকালে নাশতা খেতে খেতে আলতাফ সাহেব তাঁর দুই ছেলে টুনু মুনুকে বললেন, এই বাগেরহাটে যে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তি আছে, সে কথা তোমাদের আমি আগেই বলেছি। আজ আমরা যাব ষাট গম্বুজ মসজিদে।

রেস্ট হাউসের খুব কাছেই ষাট গম্বুজ মসজিদ। মসজিদ দেখে টুনু মুনু তো অবাক! এমন বিশাল মসজিদ তারা জীবনেও দেখেনি। কোনো মসজিদ যে এত বড় হতে পারে তা তাদের চিন্তার বাইরে। আবার তারা যখন শুনল যে, এই মসজিদ প্রায় ৫২৫ বছরেরও বেশি আগে তৈরি হয়েছিল, তারা তখন আরও অবাক হয়ে গেল।

আলতাফ সাহেব বললেন, তোমরা ভেতরে-বাইরে এবং ওপরে-নিচে খুব ভালো করে মসজিদটি দেখে নাও। তোমাদের দেখার পরে এই মসজিদ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে অনেক কথা বলব।

তাঁর কথা শুনে টুনু মুনু খুব মনোযোগের সঙ্গে এবং অনেকক্ষণ ধরে এই বিরাট কীর্তিটি দেখল। বাইরে ও ভেতরে দেখার পর আলতাফ সাহেবের সঙ্গে তারা ছাদে গম্বুজগুলো গুনে গুনে দেখল। মসজিদ দেখার পর আলতাফ সাহেব ছেলেদের কাছে বললেন, মসজিদটি যে উত্তর দক্ষিণে লম্বা, তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এটি উত্তর দক্ষিণে বাইরের দিকে প্রায় ১৬০ ফুট এবং ভেতরের দিকে প্রায় ১৪৩ ফুট লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে বাইরের দিকে প্রায় ১০৪ ফুট ও ভেতরের দিকে প্রায় ৮৮ ফুট চওড়া। দেয়ালগুলো প্রায় ৮$\frac{1}{2}$ ফুট পুরু।

মসজিদের সামনের অর্থাৎ পূর্ব দেয়ালে আছে ১১টি দরজা। দরজাগুলো যে বিরাট আকারের তা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। মাঝের দরজাটি অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ৭টি করে দরজা। মসজিদের চার কোণে আছে ৪টি বিরাট আকারের মিনার। এগুলো গোলাকার এবং কার্নিসের কাছে এগুলোতে বলয়াকারে ব্যান্ড আছে। মিনারগুলো কার্নিসের অনেক ওপরে উঠে গেছে এবং এগুলোর চূড়ায় আছে অতি সুন্দর গম্বুজ। সামনের দুটো মিনার থেকে আযান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। একটির নাম ছিল রওশন কোঠা এবং অন্যটির নাম আন্ধার কোঠা।

মসজিদের ভেতরে ৬০টি স্তম্ভ (Pillar) আছে। এগুলো জ্যামিতিক মাপে উত্তর দক্ষিণে ৬ সারিতে বসানো হয়েছে

এবং প্রত্যেক সারিতে ১০টি করে স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলোকে পাথর কেটে মাপমতো তৈরি করা হয়েছে। সব কটা স্তম্ভই পাথরের। মাত্র ৫টি স্তম্ভের পাথর বাইরের দিকে ইট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

এই ৬০টি স্তম্ভ ও চার পাশের দেয়ালের ওপর মসজিদের গম্বুজগুলো তৈরি করা হয়েছে। ছাদের ওপরে গম্বুজের মোট সংখ্যা ৭৭। পূর্ব দেয়ালের মাঝের দরজা ও পশ্চিম দেয়ালের মাঝের মেহরাবের মধ্যবর্তী স্থানে ছাদের ওপর আছে ৭টি গম্বুজ। এগুলো দেখতে অনেকটা বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের চালের মতো। বাকি ৭০টি গম্বুজ আধা গোলাকার। তবে এই ৭০টি গম্বুজ দেখতে খুব বড় নয়।

আলতাফ সাহেব বললেন, এবার তোমাদের মসজিদের মেহরাব ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলব। মসজিদের ভেতরে পশ্চিম দেওয়ালে মোট ১০টি মেহরাব আছে। মাঝের মেহরাবটি অন্যান্য মেহরাবের চেয়ে আকারে অনেক বড়। এতে পাথরের ওপর অতি সুন্দর কাজ করা আছে। আজও সেসব কাজ টিকে আছে।

এই মেহরাবের দক্ষিণে পূর্ব দেয়ালের দরজাগুলোর বরাবর ৫টি মেহরাব আছে। মাঝের মেহরাবের উত্তর দিকে আছে মোট ৪টি মেহরাব। মাঝের মেহরাবের উত্তর পাশে যেখানে একটি মেহরাব থাকার কথা, সেখানে আছে একটি ছোট দরজা। এই দরজার কথা তোমাদের একটু পরেই বলছি।

টুনু বলল, আচ্ছা আব্বা, একটা বিষয়ে আমার খটকা লাগছে। ছাদের ওপরে দেখলাম ৭৭টি গম্বুজ আছে। আবার চারটি মিনারের ওপরও আছে ৪টি গম্বুজ। তাতে মোট গম্বুজের সংখ্যা ৮১টি। কিন্তু এটিকে ষাট গম্বুজ মসজিদ বলা হয় কেন?

আলতাফ সাহেব খুশি হয়ে বললেন, তোমার প্রশ্নটি খুবই সুন্দর হয়েছে। কিন্তু এর ঠিকঠাক জবাব আমি দিতে পারব না। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু কোনো কথাই খুব সন্তোষজনক নয়। তবে বহু কাল আগে থেকেই এটি ষাট গম্বুজ মসজিদ নামে পরিচিত হয়ে আসছে এবং সবাই এটিকে এ নামেই জানে।

কেউ কেউ বলেন যে, নামাযের কাজ ছাড়া অন্য কাজেও মসজিদটি ব্যবহার করা হত। খান–ই–জাহান এটিকে দরবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন বলেও বলা হয়ে থাকে। মাঝের মেহরাবের উত্তর দিকে যে একটি ছোট দরজা আছে, সেটি দিয়ে তিনি নাকি দরবারে ঢুকতেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এই মসজিদ মাদ্রাসা হিসেবেও ব্যবহৃত হত। তা অসম্ভব নয়।

মসজিদের গায়ে কোনো শিলালিপি নেই, কোনো কালে ছিলও না। তাই এটি কে তৈরি করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মসজিদ তৈরির কায়দা–কানুন দেখে পণ্ডিতেরা এক কথায় স্বীকার করেন যে, এটি খান–ই–জাহানের কীর্তি। এই মসজিদ যে খান-ই-জাহান তৈরি করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুনু প্রশ্ন করল, আচ্ছা আব্বা, এই যে তুমি বললে খান-ই-জাহানের কথা, ইনি কে?

আলতাফ সাহেব বললেন, তিনি ছিলেন এক জন দক্ষ শাসনকর্তা এবং সেই সঙ্গে একজন ইসলাম ধর্ম প্রচারকও। সুন্দরবন অর্থাৎ যশোর–খুলনা এলাকায় তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়। ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজ করলেও তিনি হিন্দু মুসলমান সকল মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন এবং মানুষের যাতে ভালো হয় সে চেষ্টা করতেন। তিনি সম্রাট শাহ্‌জাহানের প্রায় ২০০ বছর আগেকার লোক। তিনি কোনো সম্রাট ছিলেন না, এমনকি কোনো বাদশাহ্‌ বা সুলতানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন খুব সম্ভব একজন স্থানীয় শাসনকর্তা।

সবশেষে আলতাফ সাহেব বললেন, এই সুন্দর মসজিদটি দেখে তোমরা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছ। বহু টাকা খরচ করে এবং বহু বছর ধরে এই মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। পাথরগুলো আনানো হয়েছিল রাজমহল থেকে। এত বড় প্রাচীন মসজিদ বাংলাদেশে আর একটিও নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

রেস্ট হাউজ— বিশ্রামাগার।

প্রত্নতত্ত্ব— প্রাচীন মুদ্রা, লিপি ও ধ্বংসাবশেষ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যা।

কীর্তি— গৌরবজনক বা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

গম্বুজ— মসজিদ, মন্দির বা দালানের ঊর্ধ্বমুখী গোলাকার ছুঁচালো অংশ।

বলয়াকার— বালার মত চক্রাকার।

ব্যান্ড— বন্ধনী।

কার্নিস— দেয়ালের বাইরে ছাদের প্রান্তভাগ, আলিসার বর্ধিত অংশ।

রওশন— আলো।

মেহরাব— মসজিদের দেয়ালে কেবলামুখী ছোট খোপ, যার সামনে ইমাম দাঁড়ান।

পাঠ-পরিচিতি

ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। 'একটি অনন্য পুরাকীর্তি' রচনায় রয়েছে এই মসজিদের চাক্ষুষ বর্ণনা।

আলতাফ সাহেব তাঁর পুত্র টুনু ও মুনুকে নিয়ে বাগেরহাট গেছেন ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখতে। মসজিদের কাছেই একটি বিশ্রামাগারে ওঠেন তাঁরা। পরদিন সকালে তাঁরা সবাই মিলে মসজিদটি দেখলেন। এত বিশাল মসজিদ টুনু মুনু জীবনেও দেখেনি। তারা আরও অবাক হল যখন শুনল মসজিদটি প্রায় ৫২৫ বছরের বেশি আগে তৈরি।

মসজিদটির বাইরে ভেতরে ঘুরে ফিরে দেখার পর আলতাফ সাহেব মসজিদের গঠনকাঠামো সম্পর্কে নানা তথ্য জানালেন পুত্রদের। তাঁর দেওয়া তথ্য, পুত্রদের নানা জিজ্ঞাসা থেকে এই মসজিদ সম্পর্কে যা জানা যায়, তা এরকম: মসজিদটি বাইরের দিকে দৈর্ঘ্যে ১৬০ ফুট, প্রস্থে ১০৪ ফুট আর ভেতরের দিকে দৈর্ঘ্যে ১৪৩ ফুট, প্রস্থে ৮৮ ফুট। দেয়ালগুলো প্রায় ৮ $\frac{১}{২}$ ফুট পুরু। পূর্ব দিকে আছে বিরাট আকারের ১১টি দরজা। উত্তর ও দক্ষিণের দেয়ালে আছে ৭টি করে দরজা। চার কোণে আছে ৪টি বিরাট আকারের মিনার। তার ওপরে রয়েছে ৪টি সুন্দর বড় গম্বুজ।

মসজিদের ভেতরে রয়েছে ৬০টি স্তম্ভ। কিন্তু ছাদের ওপরে গম্বুজের সংখ্যা ৭৭টি। চার কোণের চারটি বিরাট মিনারের গম্বুজ নিয়ে মোট গম্বুজের সংখ্যা ৮১টি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' নামেই পরিচিত।

মসজিদের ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে ১০টি মেহরাব; মাঝখানের মেহরাবটিতে সুন্দর কাজ করা। পূর্ব দেয়ালের স্তম্ভগুলোর ওপর রয়েছে ৫টি মেহরাব। মাঝের মেহরাবের উত্তর পাশে আছে ৪টি মেহরাব। ঐ অংশে আরও যে একটি মেহরাব থাকার কথা, সেখানে আছে একটি ছোট দরজা।

অনুমান করা হয়, মসজিদটি দরবার হিসেবেও ব্যবহৃত হত। আর ঐ দরজাটি ব্যবহার করতেন মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা খান-ই-জাহান। অবশ্য এই মসজিদ মাদ্রাসা হিসেবেও ব্যবহৃত হত বলে কেউ কেউ বলেছেন।

মসজিদের গায়ে কোনো শিলালিপি নেই বলে তার নির্মাতার নাম জানা যায় না। তবে খান-ই-জাহানের অন্যান্য কীর্তির সঙ্গে এর নির্মাণের কায়দার মিল দেখে পণ্ডিতরা অনেকটা নিশ্চিত যে, এটি তিনিই তৈরি করেছিলেন।

এই খান-ই-জাহান ছিলেন সেকালের এক জন দক্ষ শাসনকর্তা এবং ইসলামপ্রচারক। তিনি সম্রাট শাহ্জাহানেরও ২০০ বছর আগের লোক। সুন্দরবন ও যশোর-খুলনা এলাকায় তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

ইসলামের প্রচারক হলেও তিনি সব ধর্মের লোককেই খুব ভালোবাসতেন এবং সবার কল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন।

খান-ই-জাহান বহু অর্থ ব্যয় করে, বহু বছর ধরে এই অনন্য মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। এর পাথর আনা হয়েছিল রাজমহল থেকে। এত বড় প্রাচীন মসজিদ বাংলাদেশে আর নেই।

লেখক-পরিচিতি

আ.কা.মো. যাকারিয়া ১৯১৮ সালের ১লা অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ অনেক বেশি। তিনি ফারসি ভাষা হতে পাঁচটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ'; 'দুইখণ্ডে বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি', 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস' ইত্যাদি। তিনি সর্বমোট ৩২টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ২০০৫ সালে গবেষণার জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ষাট গম্বুজ মসজিদ-এ গম্বুজের সংখ্যা—

ক. ৬০টি খ. ৭০টি
গ. ৭৭টি ঘ. ৮১টি

২. 'একটি অনন্য পুরাকীর্তি' রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে

i. ষাট গম্বুজ মসজিদ সম্পর্কে
ii. খান-ই-জাহান আলী সম্পর্কে
iii. বাগেরহাট সম্পর্কে

নিচের কোনটি সঠিক?

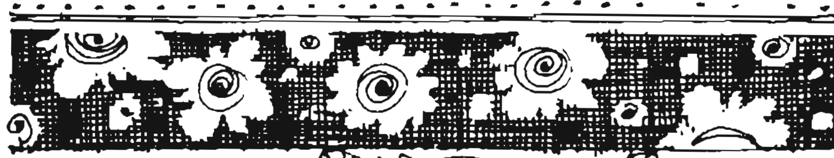
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

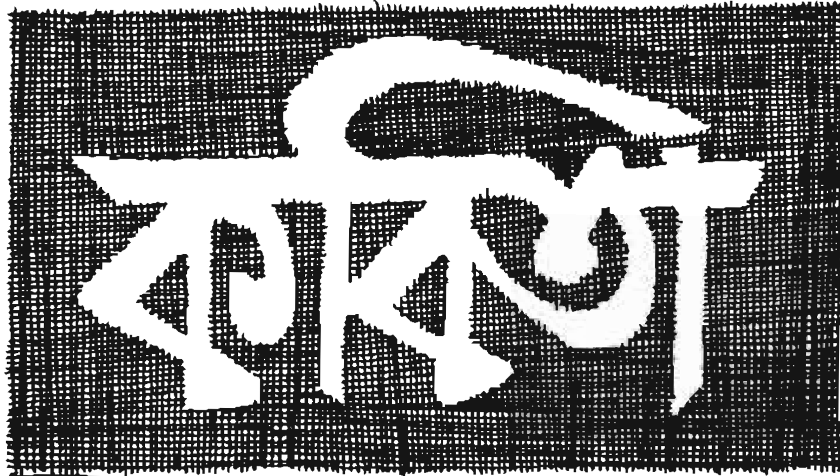
সৃজনশীল প্রশ্ন

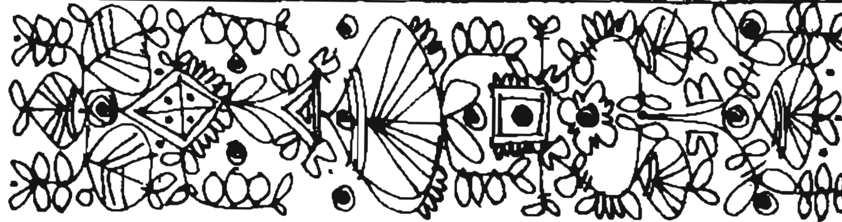
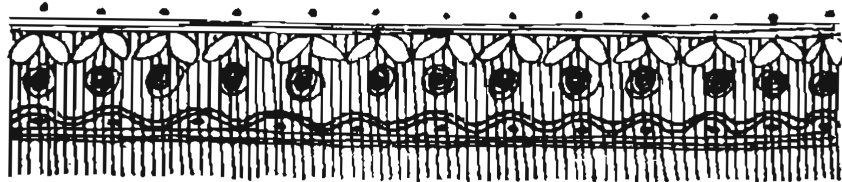
১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রহমান সাহেব তাঁর এক প্রবাসী বন্ধুর আমন্ত্রণে অস্ট্রেলিয়া ঘুরতে গিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু তাঁকে প্রবাসী বাঙালিদের এক মিলনমেলায় নিয়ে যান। সেই মিলনমেলার স্থান ছিল আঠারো শতকের স্থানীয় এক চার্চ। রহমান সাহেব খুব অবাক হয়ে বন্ধুকে বললেন, ধর্মীয় উপাসনালয়ের এই ভিন্নধর্মী ব্যবহার আমাকে খুব অবাক করেছে। তাঁর বন্ধু উত্তরে বললেন, ব্যবহারের এই প্রচলন অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে।

ক. দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত পঞ্চাশ শতকের একটি ধর্মীয় উপাসনালয়ের নাম লেখ।
খ. কীভাবে বোঝা যায় যে ধর্মীয় উপাসনালয়টি ধর্মপ্রচারক স্থানীয় এক শাসনকর্তার তৈরি?
গ. রহমান সাহেবের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
ঘ. স্থাপত্য শিল্পরূপে ষাট গম্বুজ মসজিদের মূল্যায়ন কর।





কবিতা

জন্মভূমি

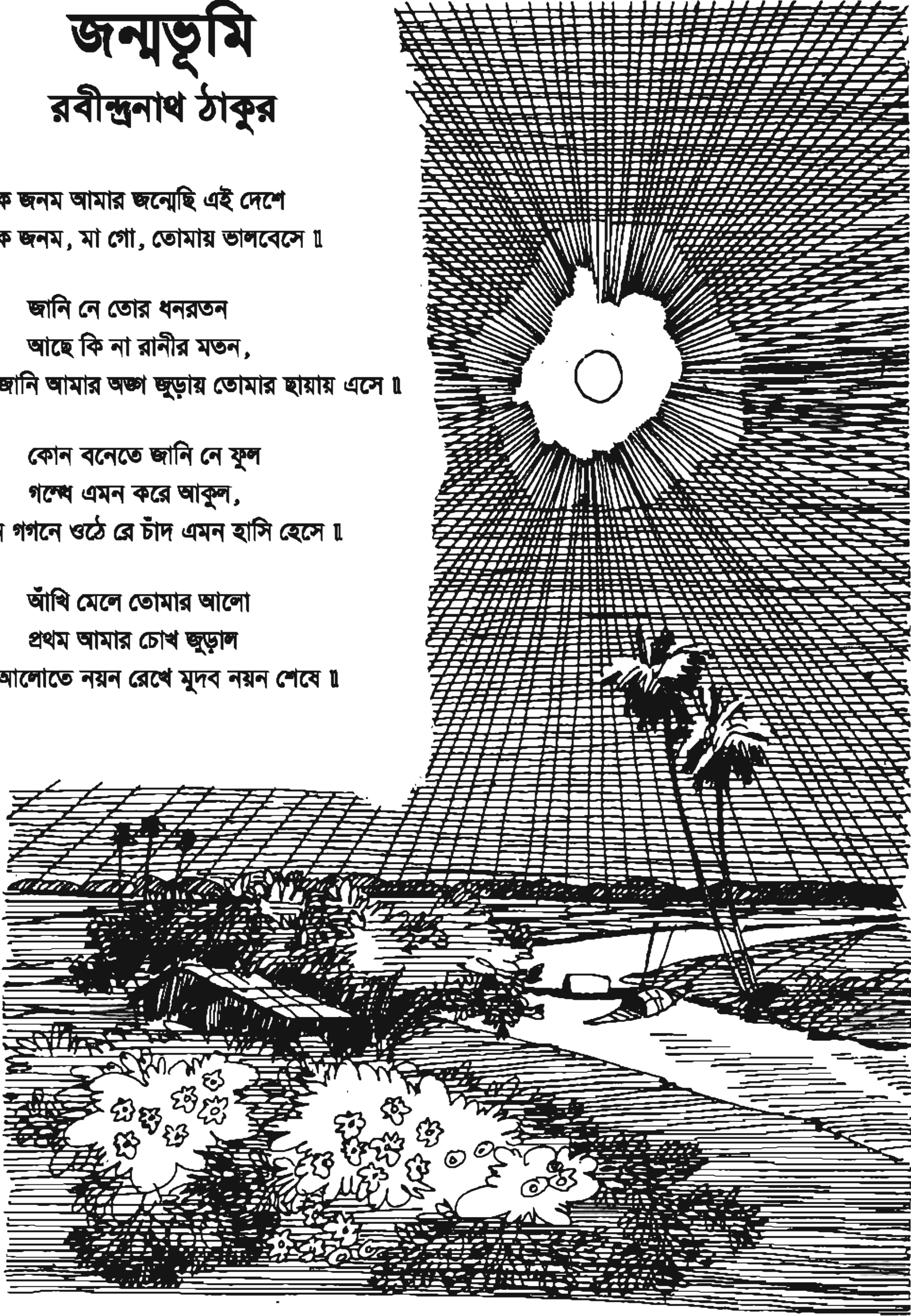
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালবেসে ॥

জানি নে তোর ধনরতন
আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥

কোন বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥

আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়াল
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥



শব্দার্থ ও টীকা

সার্থক— সফল।
জনম— জন্ম।
ধনরতন— ধনরত্ন, টাকাকড়ি ও মণিমুক্তা।
অঙ্গ জুড়ায়— দেহ পরিতৃপ্ত হয়।
গন্ধে এমন করে আকুল— মিষ্টি গন্ধে মন ভরে যায় ও আকুল হয়ে ওঠে।
মুদব— বুজব, বন্ধ করব।
মুদব নয়ন শেষে— চিরতরে চোখ বুজব।

লক্ষ কর
'জন্ম' শব্দের কোমল রূপ 'জনম'
'রত্ন' শব্দের কোমল রূপ 'রতন'

পাঠ-পরিচিতি

জন্মভূমির প্রতি কবির গভীর মমত্ব ও দেশপ্রেমময় আবেগ ফুটে উঠেছে এই কবিতায়।

এই দেশে জন্মগ্রহণ করে জন্মভূমিকে ভালোবাসতে পেরেই কবি তাঁর জীবনের সার্থকতা অনুভব করেন। কবির জন্মভূমি অজস্র ধনরত্নের আকর কি না, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। কারণ, তিনি এই মাতৃভূমির স্নেহছায়ায় যে সুখ ও শান্তি লাভ করেছেন, তা অতুলনীয়। এই জন্মভূমির অসীম ও অপরূপ সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যে কবি চিরমুগ্ধ। জন্মভূমির বিচিত্র সৌন্দর্যের অফুরন্ত উৎস হচ্ছে কাননের ফুল, চাঁদের জ্যোৎস্না, সূর্যের আলো। এসব কবির মনকে আকুল করেছে।

এই দেশের মাটিতে জন্ম নিয়ে, এর সূর্যালোকে কবির চোখ পরিপূর্ণভাবে জুড়িয়েছে। তাই কবির একান্ত ইচ্ছা—এই সূর্যালোকে, এই দেশের মাটিতেই তিনি যেন চিরনিদ্রায় যাওয়ার সুযোগ পান।

কবি-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয়নি। সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে পড়াও শেষ না হতেই তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনায় তিনি একক অবদানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন, যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান—সাহিত্যের সকল শাখাই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত একটি সংগীত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। সেগুলো সংকলিত হয়েছে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র ৩০টি খণ্ডে। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে 'কৈশোরক' নামে একটি সংকলনে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) ৮০ বছর বয়সে কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. রবীন্দ্রনাথের ছোটদের জন্য লেখা রচনাগুলো কোন গ্রন্থে সংকলিত আছে?

ক. রবীন্দ্র রচনাবলী
খ. কৈশোরক
গ. গীতাঞ্জলি
ঘ. সোনার তরী

২. কবির জীবনের সার্থকতা কোথায়?

i. এ দেশে জন্মগ্রহণ করে
ii. এ দেশকে ভালোবেসে
iii. এ দেশের প্রকৃতি দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. ii ও iii

৩. 'মুদব নয়ন শেষে' চরণটিতে 'শেষে' শব্দের ভাবার্থ

ক. সমাপ্তি
খ. পরিপূর্ণতা
গ. পরবর্তীতে
ঘ. মৃত্যুতে

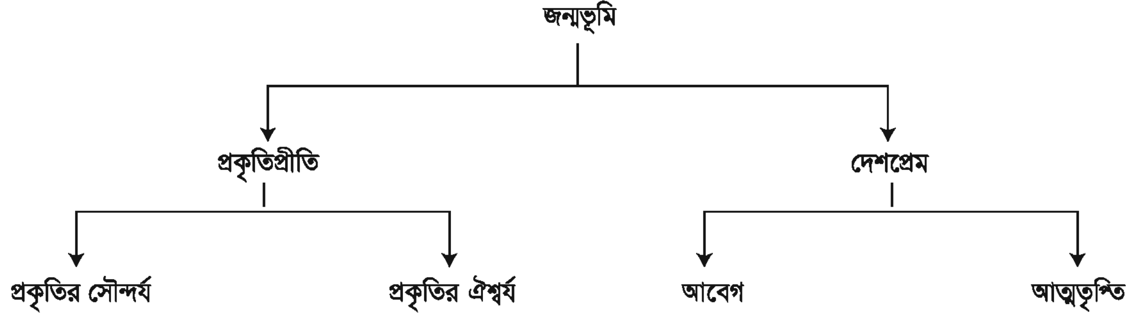
সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কবিতাংশটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

কোন বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়াল
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

ক. কবিতাংশটুকুর রচয়িতা কে?
খ. উদ্দীপকে 'বন' এবং 'গগন' কিসের ইঙ্গিত বহন করে ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্ধৃতাংশ থেকে কবির দেশপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বর্ণনা কর।
ঘ. 'ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে'–কবির আকাঙ্ক্ষার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. রেখচিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও।



ক. জন্মভূমি কবিতাটির মূল বিষয় কী?

খ. দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রকৃতিপ্রীতির যে সম্পর্ক ছকে লক্ষ করা যায়—তা বর্ণনা কর।

গ. ছকে বর্ণিত দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থে কতটুকু সহায়ক বলে তুমি মনে কর। যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. আবেগ-আপ্লুত কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের মধ্যে কীভাবে দেশপ্রেম প্রকাশ করেছেন তোমার পঠিত কবিতা অবলম্বনে বিশ্লেষণ কর।

প্রতিদান

জসীমউদ্‌দীন

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী—
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি,
দিঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর।

আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যে বা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত করিয়া তার লাগি আমি কাঁদি।
যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান,
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম-ভর,—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

মোর বুকে যে বা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে কহে সে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে করে তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কী যে আনি সাজাই নিরন্তর—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

বিবাগী— উদাসীন, নির্লিপ্ত, বন্ধনহীন, বৈরাগ্যের ফলে গৃহত্যাগী।
পথের বিবাগী— ঘরছাড়া উদাসীন।
দিঘল— দীর্ঘ।
রজনী— রাত্রি।
বিষে-ভরা বাণ— বিষাক্ত তীর।
যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ, আমি দেই তারে বুক ভরা গান— যে আমাকে যত আঘাতই দিক না কেন, প্রতিদানে আমি তাকে দিই আমার বুকভরা গান অর্থাৎ বুকভরা মমতা।
জনম-ভর— জীবন ভরে, সারা জীবন ধরে।
মোর বুকে যে বা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি— যে আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়েছে, আমি তার বুক ভালোবাসায় ভরে তুলি।
নিঠুরিয়া— নিষ্ঠুর, নির্দয়, নির্মম।
মালঞ্চ— ফুলবাগান।
ঠাঁই— জায়গা, স্থান।
নিরন্তর— অবিরাম, অনবরত, সবসময়।

পাঠ-পরিচিতি

'প্রতিদান' কবিতায় কবি উদার মানবিকতায় প্রীতিময় বাণীকে স্নিগ্ধ গীতিময়তা দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

কবি উপলব্ধি করেন, অসাধারণ প্রীতি ও অকুণ্ঠ ভালবাসা দিয়ে সব মানুষের হৃদয় জয় করতে পারাই সত্যিকার মনুষ্যত্ব। যে যেভাবেই তাঁর প্রতি শত্রুতা করতে প্রয়াসী হোক না কেন, প্রতিদানে তিনি দেবেন মমতা ও ভালোবাসা।

কেউ যদি কবির ঘর ভেঙে দেয়, তাঁকে ঘরছাড়া করে, তবে প্রতিদানে তিনি তার ঘর বাঁধার কাজে ব্রতী হবেন। তাকে আপন করে পাওয়ার জন্য পথে পথে ঘুরবেন।

কেউ যদি তাঁর ক্ষতি করে, নিষ্ঠুর আচরণ করে কিংবা কঠিন আঘাতে অন্তরকে জর্জরিত করে, কবি তাতে ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ন হবেন না। প্রতিদানে তিনি দেবেন বুকভরা মমতা। কাঁটার বদলে দেবেন ফুলের মালা।

যে যতই বিমুখ হোক, তাঁর প্রাণে যতই আঘাত দিক না কেন, তিনি নির্দ্বিধায় তা সহ্য করবেন। সকল শত্রুতা, হিংসা-দ্বেষ ও নিষ্ঠুরতাকে তিনি জয় করবেন প্রেম, প্রীতি, মমতা ও ভালোবাসার জোরে।

কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীনের কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল ছাত্রজীবনে। তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখনই তাঁর 'কবর' কবিতাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণীর বাংলা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাঁর কবিতায় সহজ-সরল ভাষায়, সাবলীল ছন্দে রূপ পেয়েছে গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও জীবনের নানান ছবি।

তাঁর বিখ্যাত 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর কবিতাগুলো ১৫টি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী, নাটক ও প্রবন্ধ লিখেছেন। শিশুদের জন্য লেখা 'ডালিম কুমার' তাঁর অনবদ্য রচনা। এ ছাড়াও ছোটদের জন্য তিনি লিখেছেন 'হাসু', 'এক পয়সার বাঁশী' ইত্যাদি কবিতাগ্রন্থ।

কর্মজীবনের শুরুতে জসীমউদ্‌দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, পরে সরকারের প্রচার বিভাগে দীর্ঘ দিন কাজ করেন। তিনি গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অনেক লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন।

কবিকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিতে সম্মানিত করে।

জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জসীমউদ্‌দীনের কোন গ্রন্থটি ছোটদের জন্য রচিত?

ক. নকশী কাঁথার মাঠ　　খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট

গ. বালুচর　　ঘ. এক পয়সার বাঁশী

২. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন?

i. ক্ষমা ও মহত্ত্ব

ii. মমতা ও সহনশীলতা

iii. প্রতিদান ও ন্যায়বিচার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃত অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

যে মোরে দিয়েছে বিষে–ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান,
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

ক. 'বাণ' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান'—চরণটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের বাণী সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটুকু ফলপ্রদ বলে তুমি মনে কর–যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্ধৃত পঙ্ক্তিগুলোর মূলভাব বিশ্লেষণ কর।

২. উদ্ধৃত অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

'প্রতিদান' কবিতার মধ্য দিয়ে কবি উপলব্ধি করেছেন, অসাধারণ প্রীতি ও অকুণ্ঠ ভালোবাসা দিয়েই মানুষ মানুষের হৃদয়কে জয় করতে পারে। কবি মনে করেন সকল শত্রুতা, হিংসা–দ্বেষ ও নিষ্ঠুরতাকে জয় করার পথ প্রতিঘাত নয়, জয় করা যায় সহনশীলতা, মমতা এবং ভালোবাসার জোরে।

ক. কবিতাটিতে কবি 'প্রতিদান' শব্দটিকে কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন?

খ. শত্রুর প্রতি কবির মনোভাব কীরূপ ব্যাখ্যা কর।

গ. ভালোবাসা সমাজে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করতে পারে— বর্ণনা কর।

ঘ. সহনশীলতা, মমতা ও ভালোবাসাই কবির 'প্রতিদানের' মূলমন্ত্র উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

আমরা কিশোর

সুনির্মল বসু



কিশোর মোরা ঊষার আলো, আমরা হাওয়া দুরন্ত
মনটি চির বাঁধন হারা পাখির মত উড়ন্ত।

আমরা আসি এই জগতে ছড়িয়ে দিতে আনন্দ,
সঞ্জীবতায় ভরিয়ে দিতে এই ধরনীর আনন তো।

আমরা সরল কিশোর শিশু ফুলের মত পবিত্র,
অন্তরেতে গোপন মোদের শিল্প, গীতি, কবিত্ব।

জাগাই যদি, লাগাই তাদের এই দুনিয়ার হিতার্থ,
ভবিষ্যতের নবীন ধরা হবেই তবে কৃতার্থ।

যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য,
ফসল লয়ে ফলবে সে বীজ একটু পেলে সাহায্য।

একান্ত যার ইচ্ছা আছে, দাম আছে তার কথার তো,
এই জগতে অবশ্য সে মানুষ হবে যথার্থ।

শোনরে কিশোর ভাইরা আমার, সত্য পথের শরণ নে,
হারিয়ে তোরা যাস নে যেন অমানুষের অরণ্যে।

শব্দার্থ ও টীকা

ঊষা— ভোরবেলা, সূর্য ওঠার আগের মুহূর্ত।

দুরন্ত— অশান্ত, দামাল, প্রবল।

উড়ন্ত— উড়ছে এমন, উড্ডীয়মান।

সজীবতা— প্রাণবন্ততা, কাজের উৎসাহ ও শক্তির প্রাচুর্য।

ধরণী— পৃথিবী।

আনন— মুখ, মুখমণ্ডল, চেহারা।

অন্তরেতে গোপন মোদের শিল্প গীতি কবিত্ব— ভবিষ্যতের শিল্পী, গায়ক, কবি প্রমুখের প্রতিভা সুপ্ত রয়েছে বর্তমান কিশোরদের অন্তরে।

ধরা— পৃথিবী।

কৃতার্থ— ধন্য, সফল।

যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য— বীজ থেকে চারা জন্মাবার জন্য যেমন বীজের খাদ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ দরকার, তেমনি কিশোরমনের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে, তার উপযুক্ত বিকাশের জন্যও দরকার জ্ঞানচর্চা, দরকার লালনের উপযুক্ত পরিবেশ।

যথার্থ— প্রকৃত, ঠিক-ঠিক।

শরণ— আশ্রয়, অবলম্বন।

অমানুষ— মানবিক গুণবর্জিত মানুষ, যে মানুষের স্বভাব ও আচরণ মানুষের মতো নয়।

পাঠ-পরিচিতি

কৈশোরের বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকার কথা রূপায়িত হয়েছে 'আমরা কিশোর' কবিতায়।

কিশোরদের জীবন যেমন ভোরের আলোর মতো দীপ্তিমান, তেমনি দুরন্ত ঝড়ো হাওয়ার মত উদ্দাম। মুক্ত স্বাধীন কিশোরমন পাখা মেলতে চায় কল্পনার দিক-দিগন্তে। তারা জগতে নিয়ে আসে আনন্দের অফুরন্ত ঝরনাধারা, চার পাশ পূর্ণ করে প্রাণের সজীবতার উচ্ছ্বাসে।

কিশোরমন অনাবিল পবিত্রতায় ভরপুর। তাদের মনের অজানালোকে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের শিল্পী, গায়ক, সাহিত্যিকের সম্ভাবনাময় প্রতিভা। এই প্রতিভাকে যদি সমাজের কল্যাণসাধনের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়, তা হলেই আগামী দিনের পৃথিবী হবে সার্থক ও সুন্দর।

বীজ থেকে ফসল ফলানোর জন্য যেমন আলো-বাতাস দরকার, মাটির রস দরকার, তেমনি এই কিশোর মনের বিকাশের জন্য চাই যথার্থ জ্ঞানচর্চা। কিশোররা যদি নিজেদের চরিত্রকে সুদৃঢ় করে, মনোবলকে শক্ত করে যথার্থ ও উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, তবেই দেশ ও দশের কল্যাণে তারা অবদান রাখতে পারবে। তা না হলে তাদের পরিণতি হবে দুঃখজনক, তারা হারিয়ে যাবে অমানুষের অরণ্যে।

কবি-পরিচিতি

সুনির্মল বসু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন শিশুসাহিত্য রচনা করে। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন দক্ষ চিত্রশিল্পী এবং পাক্ষিক 'কিশোর' পত্রিকার সম্পাদক।

তাঁর জন্ম ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকায়, যদিও তিনি জন্মগ্রহণ করেন পিতার কর্মস্থল গিরিডিতে। তিনি কবিতা, ছড়া, গল্প, কাহিনী, উপন্যাস, রূপকথা, কৌতুকনাট্য, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের একশটিরও বেশি বই লিখেছেন। শিশু–কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : 'ছানাবড়া', 'বেড়ে মজা', 'হৈ চৈ', 'তুলুস্থূল', 'কথা শেষ', 'পাততাড়ি', 'মরণের ডাক', 'ছন্দের টুং টাং', 'শহুরে মামা', 'বীর শিকারী', 'টুনটুনির গান' ইত্যাদি। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমরা কিশোর' কবিতায় কবি কিশোরদের কিসের আলো বলেছেন?

ক. উষার খ. গোধূলীর
গ. ভোরের ঘ. সূর্যের

নিচের পঙ্‌ক্তিটি পড় এবং ২ থেকে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য,
ফসল লয়ে ফলবে সে বীজ একটু পেলে সাহায্য।

২. 'যে বীজ আছে মনের মাঝে'—এ অংশে বীজ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. সম্ভাবনা খ. আশা
গ. প্রতিভা ঘ. ঘুমন্ত প্রতিভা

৩. 'যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য'—এ অংশটিতে 'আহার্য' কী?

ক. উপযুক্ত পরিবেশ খ. জ্ঞানচর্চা
গ. পরিচর্যা ঘ. প্রতিভা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের কবিতাংশটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য,
ফসল লয়ে ফলবে সে বীজ একটু পেলে সাহায্য।
একান্ত যার ইচ্ছা আছে, দাম আছে তার কথার তো,
এই জগতে অবশ্য সে মানুষ হবে যথার্থ।
শোনরে কিশোর ভাইরা আমার, সত্য পথের শরণ নে,
হারিয়ে তোরা যাস নে যেন অমানুষের অরণ্যে।

ক. কবিতাংশটির কবি কে?
খ. 'যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য'—এ অংশটি বুঝিয়ে লেখ।
গ. কিশোরদের যথার্থ মানুষরূপে গড়তে কীরূপ পদক্ষেপ নেয়া দরকার—উদ্দীপকের আলোকে উপস্থাপন কর।
ঘ. উদ্ধৃত কবিতাংশটির আলোকে কৈশোরের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'আমরা কিশোর' কবিতায় কবি কিশোরদের মনকে সহজ, সরল ও ফুলের মতো পবিত্র বলেছেন। তাদের মনের গভীরে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের শিল্পী, গায়ক, কবি–সাহিত্যিকের সুপ্ত প্রতিভা। এই সুপ্ত প্রতিভাকে কবি বলেছেন বীজ। কিশোরদের মনের এই সুপ্ত প্রতিভার যথার্থ বিকাশ হলেই পৃথিবী হবে সার্থক ও সুন্দর।

ক. 'আমরা কিশোর' কবিতায় কবি কাদের জয়গান করেছেন?

খ. কিশোরদের মনকে কবি সহজ, সরল ও ফুলের মতো পবিত্র বলেছেন কেন?

গ. 'কিশোরদের মনের এই সুপ্ত প্রতিভার যথার্থ বিকাশ হলেই পৃথিবী হবে সার্থক ও সুন্দর'–এ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ কীভাবে সম্ভব 'আমরা কিশোর' কবিতা অবলম্বনে লেখ।

ঘ. পৃথিবীকে সুন্দর ও সার্থক করতে কিশোরমনের ভূমিকার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

কুলি-মজুর

কাজী নজরুল ইসলাম



দেখিনু সে দিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নিচে ফেলে—
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল !

যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সাব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে—
বেতন দিয়াছ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল !
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল ?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল তো এ সব কাহাদের দান ? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ?— ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান নাক কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ ঐ জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে !

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়–কাটা সে পথের দু–পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান—
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

দধীচি— পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত এক জন মুনি। ইনি স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছিলেন যেন তাঁর বুকের হাড় দিয়ে বজ্র তৈরি করে অসুরদের ধ্বংস করা যায়।

যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে— ঋষি দধীচির আত্মত্যাগের মতোই কুলি–মজুরদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে চলছে রেলগাড়ি।

বাষ্প–শকট— বাষ্প দ্বারা চালিত গাড়ি, রেলগাড়ি।

পাই— এক পয়সার তিন ভাগের এক ভাগ (বর্তমান এক টাকার ১৯২ ভাগের এক ভাগ)।

ক্রোর— কোটি, শত লক্ষ।

কল— যন্ত্রপাতি, কল–কারখানা।

ঠুলি— চোখের ঢাকনি।

ঠুলি খুলে দেখ প্রতি ইটে আছে লিখা— চোখের সামনে থেকে অহমিকা ও সভ্যতার ইমারতের আবরণ সরিয়ে নিলে দেখা যাবে, শ্রমজীবী মানুষের রক্ত–পানি–করা মেহনতে গড়ে উঠেছে সভ্যতার প্রতিটি ইট।

শাবল— লোহার তৈরি মাটি খোঁড়ার হাতিয়ার।

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা— দীর্ঘকাল ধরে শোষণের ফলে শ্রমজীবী মানুষের দাবি হয়েছে বিরাট আর তাদের মনে জমেছে ক্ষোভের পাহাড়।

গাইতি— পিচের রাস্তা কাটার জন্য ব্যবহৃত দুমুখো কুড়াল।

বক্ষে— বুকে।

নব–উত্থান— নতুন আবির্ভাব বা অভ্যুদয় বা বিদ্রোহ।

পাঠ–পরিচিতি

'কুলি–মজুর' কবিতায় কবি মানবসভ্যতার যথার্থ রূপকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পক্ষে কলম ধরেছেন।

যুগ যুগ ধরে কুলি–মজুরের মতো লক্ষকোটি শ্রমজীবী মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। এদেরই অক্লান্ত শ্রমে ও ঘামে মোটর, জাহাজ, রেলগাড়ি চলছে। গড়ে উঠেছে দালানকোঠা, কলকারখানা। এদের শোষণ করেই ধনিকশ্রেণী হয়েছে বিত্ত সম্পদের মালিক। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমাজে এরাই সবচেয়ে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। এক শ্রেণীর হৃদয়হীন স্বার্থান্ধ মানুষ এদের শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া বিত্ত–সম্পদের সবটুকুই ভোগ করছে অথচ এদের তারা মানুষ হিসেবে গণ্য করতেও নারাজ।

মানবতাবাদী কবির দৃঢ় বিশ্বাস, এই অবিচার আর চলবে না। শুরু হয়েছে দিন–বদলের পালা। লাঞ্ছিত বঞ্চিতের দল জাগতে শুরু করেছে। তাদের সংঘবদ্ধ উত্থানের দিন এসেছে। অত্যাচারীকে অচিরেই চুকিয়ে দিতে হবে হিসেব–নিকেশের পালা। কবি এই শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করে বলেন, স্বার্থপর মানুষ এদের ঘৃণা করলেও এরাই আসলে মানুষরূপী দেবতা। এই শ্রমজীবী মানুষের ত্যাগের মাধ্যমে আসবে মানবমুক্তির নতুন দিন।

কবি–পরিচিতি

অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং বিপ্লব ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় কবিতা লিখে বাংলার জনমনে যিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে নন্দিত আসন পেয়েছেন, তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় লেটোর দলে গান করেছেন, রুটির দোকানের কারিগর হয়েছেন, সেনাবাহিনীর হাবিলদার হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করেছেন। তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

তিনি যে শুধু বড়দের জন্য লিখেছেন তা নয়, ছোটদের জন্যও লেখা তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে–'ঝিঙেফুল', 'সঞ্চয়ন', 'পিলে পটকা', 'ঘুম জাগানো পাখি', 'ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি' এবং নাটক হচ্ছে 'পুতুলের বিয়ে'।

নজরুলের কবিতা ও গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর লেখা গান 'উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' আমাদের রণ–সংগীত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

নজরুলের জন্ম ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সালে (২৪শে মে ১৮৯৯) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। তাঁর মৃত্যু ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩ সালে (২৯শে আগস্ট ১৯৭৬) ঢাকায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল'—কাদের বিরুদ্ধে কবি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন?

ক. মিথ্যাবাদীদের খ. ধনীদের
গ. সুবিধাভোগীদের ঘ. স্বার্থপর সম্পদশালীদের

২. 'কুলি–মজুর' কবিতায় কবি কাদের জয়গান করেছেন?

ক. কুলিদের খ. মজুরদের
গ. শ্রমজীবীদের ঘ. বঞ্চিতদের

৩. 'দেখিনু সে দিন রেলে'—এ চরণের 'দেখিনু' শব্দের প্রকৃত ভাব—

ক. দেখে খ. দেখিয়া
গ. হেরি ঘ. দেখলাম

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অংশটুকু পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল।
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেল পথে চলে বাষ্প–শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল তো এসব কাহাদের দান?

ক. উদ্দীপকে কবি কাদের বেতন দেওয়ার কথা বলেছেন?

খ. উদ্দীপকে কবি কাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন?

গ. সমাজ উন্নয়নে শ্রমিকদের কীভাবে ব্যবহার করা উচিত? উদ্দীপকের আলোকে উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্দীপকে মানবসভ্যতার যে দিক তুলে ধরা হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।



আনন্দ

সুকুমার রায়

যে আনন্দ ফুলের বাসে,
যে আনন্দ অরুণ আলোয়,
যে আনন্দে বাতাস বহে,
যে আনন্দ ধূলির কণায়,
যে আনন্দে আকাশ ভরা,
যে আনন্দ সকল সুখে,
সে আনন্দ মধুর হয়ে
সে আনন্দ আলোর মত

যে আনন্দ পাখির গানে,
যে আনন্দ শিশুর প্রাণে,
যে আনন্দ সাগরজলে,
যে আনন্দ তৃণের দলে,
যে আনন্দ তারায় তারায়,
যে আনন্দ রক্তধারায়,
তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
থাকুক তব জীবন ভরি।



শব্দার্থ

অরুণ— সূর্য, রক্তের মতো লাল। রক্তিম।

বাস— গন্ধ, সুবাস।

পাঠ–পরিচিতি

'আনন্দ' কবিতাটিতে সুকুমার রায় জীবনের আনন্দ সম্পর্কে নিজের অনুভবকেই প্রকাশ করেছেন। জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে অপরিসীম আনন্দের উৎস। সে আনন্দ পাওয়া যায় ফুলের সৌরভে, পাখির কলকাকলিতে, সূর্যের আলোয় ও শিশুর সরল প্রাণোচ্ছলতায়। আনন্দ বয়ে যায় বাতাসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহে এবং সাগরের ঢেউয়ের দোলায়। আকাশের তারার মেলা থেকে ধুলো–মাটির পৃথিবীর ঘাসে ঘাসে আনন্দের অপার বিস্তার। মানুষের জীবনেও রয়েছে আনন্দের নানা উপকরণ ও উৎস। মানুষ আনন্দ পায় সুখে ও পরিতৃপ্তিতে। তখন রক্তে জাগে আনন্দের নাচন। পৃথিবীর এই বিশাল আনন্দলোকে মানুষের জীবন আলোকশুভ্র ও আনন্দময় হয়ে উঠুক এটাই কবির প্রার্থনা।

কবি–পরিচিতি

শিশু–কিশোর পাঠকদের কাছে সুকুমার রায় একটি প্রিয় নাম। তাঁর 'আবোল–তাবোল', 'হ–য–ব–র–ল' ও অন্যান্য অতুলনীয় লেখার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুকুমার রায় বিখ্যাত শিশু–সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও শিশুসাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের পিতা। সুকুমার রায়ের জন্ম কলকাতায় ১৮৮৭ সালের ৩রা অক্টোবর। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ময়মনসিংহের মসুয়া গ্রামে। সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর।

সুকুমার রায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি এক দিকে বিজ্ঞান, ফটোগ্রাফি ও মুদ্রণ প্রকৌশলে উচ্চশিক্ষা নিয়েছিলেন, অন্য দিকে ছড়া রচনা ও ছবি আঁকায় মৌলিক প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'গোড়ায় গলদ' নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন তিনি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক অদ্ভুত ক্লাব। নাম—'ননসেন্স ক্লাব'। এই ক্লাবের পত্রিকার নাম ছিল 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। আর তার রচনাগুলোও অদ্ভুত ও মাজাদার। হাঁসজারু, বকচ্ছপ, সিংহরিণ, হাতিমি ইত্যাদি কাল্পনিক প্রাণীর নাম তাঁরই সৃষ্টি।

বিখ্যাত 'সন্দেশ' পত্রিকা বেশ কয়েক বার সম্পাদনা করেছেন সুকুমার রায়। আর একে কেন্দ্র করেই ঐ সময় সুকুমার রায়ের সাহিত্যপ্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল। সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন প্রধানত খেয়াল রসের কবিতা, হাসির গল্প, নাটক ইত্যাদি শিশুতোষ রচনার জন্য। ছেলেবুড়ো সবাই তাঁর লেখা পড়ে আনন্দ পায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আনন্দ' কবিতাটি কে লিখেছেন?

ক. সুকুমার রায় খ. কামিনী রায়

গ. কালিদাস রায় ঘ. সুনির্মল বসু

২. 'সে আনন্দ তারায় তারায়'–এর পরের চরণে কোথায় আনন্দের কথা বলা হয়েছে?
   i. তৃণের দলে
   ii. সকল সুখে
   iii. রক্তধারায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. ii
গ. ii ও iii   ঘ. iii

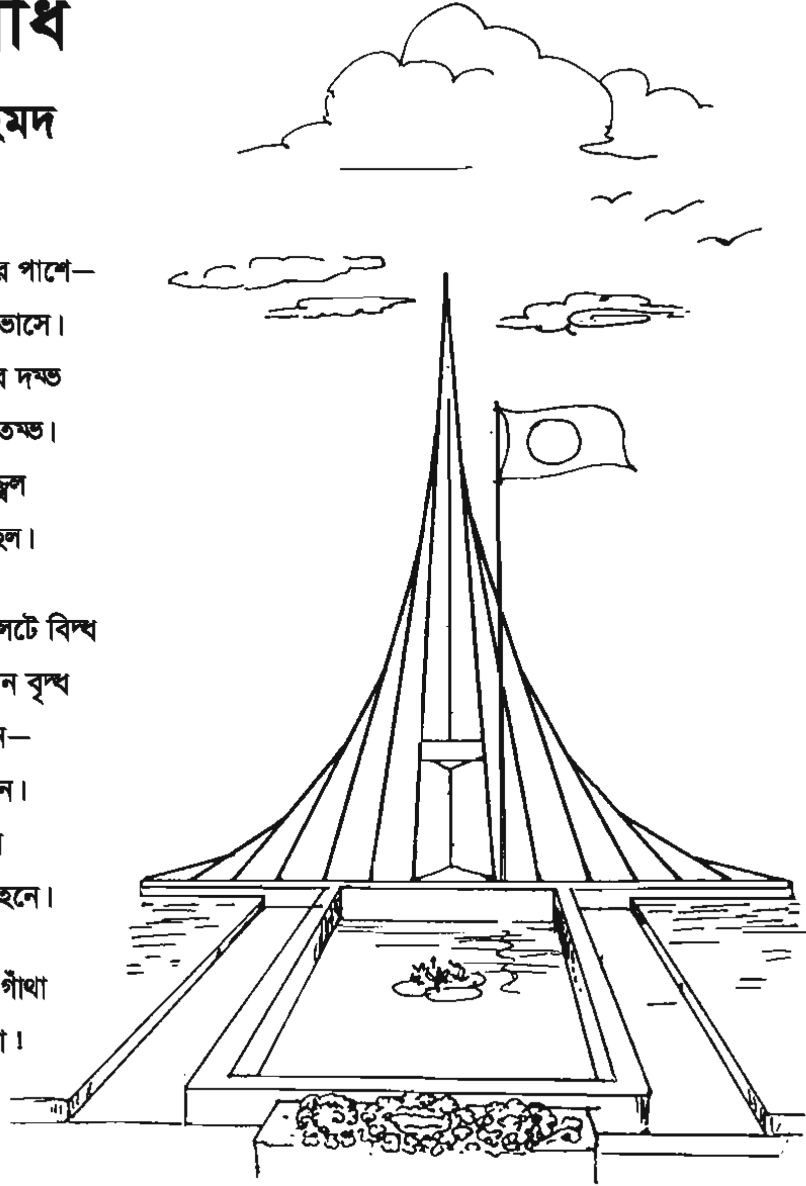
৩. সে আনন্দ মধুর হয়ে তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
সে আনন্দ আলোর মতো থাকুক তব জীবন ভরি।
উদ্ধৃতাংশে কবির কী ধরনের কামনা প্রকাশ পেয়েছে?
   ক. মানুষের আলোকিত আনন্দময় জীবন
   খ. মানুষের সুখ সমৃদ্ধ জীবন
   গ. মানুষের দীর্ঘ আনন্দিত জীবন
   ঘ. মানুষের আলোকিত দীর্ঘ জীবন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে অপরিসীম আনন্দের উৎস। প্রকৃতির নানা উপকরণ এবং শিশুর সরল প্রাণোচ্ছলতায় সে আনন্দ লক্ষণীয়। মানুষের জীবনেও রয়েছে আনন্দের নানা উপকরণ ও উৎস। মানুষ আনন্দ পায় সুখে ও পরিতৃপ্তিতে। পৃথিবীর এই আনন্দলোকে মানুষের জীবন আনন্দময় হয়ে উঠুক।
   ক. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু তোমার পঠিত কোন কবিতায় লক্ষ করা যায়?
   খ. উদ্দীপকের আলোকে আনন্দলাভের উপকরণাদির একটি বর্ণনা দাও।
   গ. জীবনকে আনন্দময় করে কীভাবে গড়ে তোলা যায়—তোমার পঠিত কবিতার আলোকে যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
   ঘ. মানবজীবনে প্রকৃতির যে প্রভাব লক্ষ করা যায় তার উপর একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা কর।

স্মৃতিসৌধ

ফয়েজ আহমদ



সাভারে গিয়েছ স্মৃতিসৌধের পাশে–
তিরিশ লক্ষ শহীদের স্মৃতি ভাসে।
সেখানে সাহসী বীর যোদ্ধার দম্ভ
তাদের রক্তে এই সৌধের স্তম্ভ।
ইতিহাসে তারা হৃদয়ে সমুজ্জ্বল
তোমরা সেখানে শ্রদ্ধায় উচ্ছল।

বিদেশী সেনার কামানে–বুলেটে বিদ্ধ
নারী শিশু আর যুবক–জোয়ান বৃদ্ধ
শত্রুসেনারা হত্যার অভিযানে–
মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধ উত্থানে।
মুক্তির পথ যুদ্ধের রথ জেনে
ঘাতক ধ্বংস করেছে অস্ত্র হেনে।

স্মৃতিসৌধের প্রতিটি কণায় গাঁথা
মুক্তিসেনার রক্ত দানের গাথা !

শব্দার্থ ও টীকা

সাভার— ঢাকার অদূরে একটি জায়গা। এখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

স্মৃতিসৌধ— দেশ প্রেমিক ব্যক্তি, জাতীয় বীর, অজ্ঞাতনামা সৈনিক কিংবা শহীদদের স্মৃতির স্মরণে নির্মিত স্তম্ভ, ভবন ইত্যাদি স্থাপত্যকর্ম।

দম্ভ— অহংকার, গৌরব।

সমুজ্জ্বল— অত্যন্ত দীপ্তিময়।

উচ্ছল— উথলে উঠেছে এমন।

রথ— প্রাচীনকালের যুদ্ধযান, এক ধরনের চাকাওয়ালা গাড়ি।

ঘাতক— হত্যাকারী, খুনি, জল্লাদ।

হেনে— আঘাত করে।

পাঠ-পরিচিতি

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ এই কবিতার ভাববস্তু।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়েছে তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে। জানা-অজানা অগণিত শহীদের সেই মহান আত্মদানের স্মৃতিকে অম্লান ও অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকার অদূরে সাভারে নির্মিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এ স্মৃতিসৌধ স্মরণ করিয়ে দেয় দেশপ্রেমিক সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় বীরত্বের কথা, স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁদের মহান আত্মত্যাগের কথা। তাঁদের বীরত্বগাথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এদেশের ইতিহাসে। জাতি চিরকাল তাঁদের স্মরণ করবে গভীর শ্রদ্ধায় ও পরম ভালোবাসায়।

একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কামান ও বুলেটের আঘাতে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছিল শত সহস্র নারী-শিশু-বৃদ্ধ-যুবাকে। সেই হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে লড়েছে এদেশের দেশব্রতী মুক্তিসেনারা। সশস্ত্র সংগ্রামে পরাজিত করেছে পাকিস্তানি জল্লাদবাহিনীকে। বিজয় ছিনিয়ে আনতে গিয়ে ঝরে গেছে অগণিত তরুণ মুক্তিযোদ্ধার জীবন। তাঁদের রক্তে লেখা গৌরবময় ইতিহাসের অনন্য স্মারক এই স্মৃতিসৌধ।

কবি-পরিচিতি

ফয়েজ আহমদ একাধারে ছড়াকার ও শিশুসাহিত্যিক। তাঁর পেশা সাংবাদিকতা। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও তিনি অন্যতম সংগঠক।

শিশু-কিশোর গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশু-কিশোর গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'তাতা থৈ থৈ', 'বোকা আইভান', 'কামরুল হাসানের চিত্রশালায়', 'তুলির সাথে লড়াই', 'বাজনা কিসের', 'প্রতিবাদের ছড়া' ইত্যাদি।

ফয়েজ আহমদের জন্ম ১৯৩২ সালের ২রা মে মুন্সীগঞ্জ জেলার বাসাইলভোগ গ্রামে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল?

ক. ১৯৬৯ সালে খ. ১৯৫২ সালে

গ. ১৯৭০ সালে ঘ. ১৯৭১ সালে

২. শত্রুসেনা কারা?

ক. প্রতিবেশী দেশের বাহিনী খ. মিত্রবাহিনী

গ. পাকবাহিনী ঘ. ভারতবাহিনী

৩. রথ কী?

i. এক ধরনের জাহাজ

ii. প্রাচীনকালের যুদ্ধযান

iii. আধুনিক জেট বিমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. iii

গ. i ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শহীদদের রক্তে লেখা গৌরবময় ইতিহাস আমাদের পথ চলার শক্তি। তাঁদের চেতনায় আমরা হব বলীয়ান। তাঁদের বীরত্বগাথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাদের স্মরণেই গড়ে উঠেছে স্মৃতিসৌধ।

ক. স্মৃতিসৌধ কোথায় নির্মাণ করা হয়েছে?

খ. স্মৃতিসৌধ কেন নির্মাণ করা হয়েছে?

গ. ভাষা–শহীদদের স্মরণ করার জন্য তোমার বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ ও ভাষা দিবস পালনের অভিজ্ঞতা লেখ।

ঘ. 'শহীদের রক্তে লেখা গৌরবময় ইতিহাস আমাদের পথ চলার শক্তি'–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

রসাল ও স্বর্ণলতিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে :—
শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ, বিধাতারে।
নিদারুণ তিনি অতি;
নাহি দয়া তব প্রতি;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!
দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ চরণে।
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে!
তুমি কি তা জান না, ললনে?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখি বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে!
ধন্য মোর জনম সংসারে!
কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুঃখী
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখী!



নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু–সহ দর্প বনস্থলে !

উর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে ;
করিও না ঘৃণা তবু নিচ–শির জনে।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

রসাল— আমগাছ।

স্বর্ণলতিকা— স্বর্ণলতা, সোনালি রঙের এক রকম হালকা পরগাছা লতা।

ধনি— যুবতী, সুন্দরী।

নিন্দ— নিন্দা কর, বদনাম কর।

বিধাতা— সৃষ্টিকর্তা।

নিদারুণ— খুব কঠোর, নির্মম।

তেঁই— সে জন্যেই, সেই কারণে।

কায়া— দেহ, শরীর।

সৃজিলা— সৃষ্টি করলেন।

মলয়— দখিনা বাতাস।

নতশিরা— মাথা নিচু করে আছে এমন, নত মাথা। শব্দটি মূলত 'নতশির'। এর স্ত্রীবাচক রূপ–'নতশিরা'।

মলয় বহিলে, হায়, নতশিরা তুমি তায়— বাতাস বইলে স্বর্ণলতার ডগা নিচের দিকে ঝুলতে থাকে। তাই রসাল স্বর্ণলতাকে নতশিরা বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে।

তায়— তার ফলে।

মধুকর— মৌমাছি, ভ্রমর।

মধুকর–ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া— মৌমাছি স্বর্ণলতার ডগায় বসলে তা ঢলে পড়ে বলে আমগাছ তাকে অবজ্ঞা করছে।

হিমাদ্রি— হিমালয়।

সদৃশ— মতো।

হিমাদ্রি সদৃশ আমি— আমগাছ এই কথা বলে নিজেকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করছে। এটি তার অহংকারী মনের পরিচয়।

বন–বৃক্ষ–কুল–স্বামী— বনের সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মেঘলোক— আকাশ, মেঘের রাজ্য।

শির— মাথা, মস্তক।

লভয়ে— লাভ করে।

অনুক্ষণ— সর্বদা, সব সময়।

বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ— সব সময় বিশ্রাম নেয়।

রাজ–কাজ দরিদ্র পালন— রাজা যেমন দরিদ্র প্রজাদের প্রতিপালনে সহায়তা করেন, তেমনি সকলকে ছায়া এবং রাখালকে বিশ্রামের সুযোগ দেয় বলে আমগাছ নিজেকে রাজার সঙ্গে তুলনা করে বড়াই করছে।

প্রসাদ— অনুগ্রহ।

ভুঞ্জে— ভোগ করে।

ললনে— হে সুন্দরী।

আগারে— গৃহে, ঘরে।

বিধুমুখী— চন্দ্রমুখী, চাঁদের মতো মুখ যে নারীর। স্ত্রীবাচক বলে 'বিধুমুখী'।

নীরবিলা— নীরব হল।

তরুরাজ— বৃক্ষকুলের রাজা, এখানে আমগাছ অর্থে ব্যবহৃত।

যমদূতাকৃতি— যমদূতের মতো ভয়ংকর আকারের।

স্বননে— শব্দে।

মহাঘাতে— প্রচণ্ড আঘাতে।

ভূতলে— মাটির ওপরে।

দর্প— অহংকার, বড়াই, গর্ব।

বনস্থলে— অরণ্যে, বনভূমিতে।

হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে— প্রবল বাতাসের তোড়ে সমূলে উৎপাটিত হলে আমগাছটির আয়ু শেষ হয়। সেই সঙ্গে তার সমস্ত অংহকারও চুরমার হয়ে যায়।

উর্ধ্বশির— উঁচু মাথা যার। এখানে শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুল–মান–ধনে— বংশগৌরব, মান–মর্যাদা ও টাকা–পয়সায়।

নিচ–শির জনে— কুলে–মানে–ধনে যে নিম্ন পর্যায়ের, তাকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠ–পরিচিতি

'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' কবিতায় কবি মানবজীবনের একটি শিক্ষণীয় দিককে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

সমাজে এক ধরনের লোক আছে যারা ধনসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, বংশমর্যাদা ইত্যাদিতে বড় হওয়ায় বিশেষ গৌরব ও অহংকার বোধ করে। এ ধরনের লোক সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করে আনন্দ পায়। কিন্তু তারা এ কথা জানে না যে, অহংকারের শেষ হয় পতনে আর শ্রেষ্ঠত্ব কখনও চিরদিন বজায় থাকে না। এই শিক্ষণীয় দিকটিকে এ কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে স্বর্ণলতার প্রতি আমগাছের আচরণের মধ্য দিয়ে।

আমগাছ আকারে বিশাল। সে তুলনায় স্বর্ণলতা নিতান্ত ছোট। অহংকারী আমগাছ তাই নিজের প্রশংসা আর স্বর্ণলতার নিন্দায় মুখর। নানাভাবে সে স্বর্ণলতাকে উপহাস, বিদ্রূপ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে।

কিন্তু এক সময় যখন প্রবল বেগে ঝড় উঠল, ঝড়ের তাণ্ডবে সেই বিশাল আমগাছ মুহূর্তে উৎপাটিত হল। তখন তার সমস্ত অহংকার চুরমার হয়ে গেল।

কবি-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভাধর কবি।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং সার্থক মহাকাব্য তিনিই লেখেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা কবিতায় তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রথম আধুনিক বাংলা নাটকও রচিত হয় তাঁর হাতে। বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক প্রহসন ও সনেট তিনিই রচনা করেন।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর নামের আগে মাইকেল কথাটি যুক্ত হয়েছে। সাহিত্যচর্চার শুরুতে তিনি ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা করেছিলেন। পরে তাঁর ভুল ভাঙে এবং তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে চিরস্মরণীয় হন।

মাইকেল মধুসূদনের জন্ম যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে, ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রসাল শব্দের অর্থ

ক. রসযুক্ত খ. আম
গ. আমগাছ ঘ. মিষ্টান্ন

২. 'নিদারুণ তিনি অতি;
নাহি দয়া তব প্রতি'
এই উক্তিটি কার?

ক. স্বর্ণলতিকার খ. রসাল-এর
গ. রাজার ঘ. মৌমাছির

৩. 'লভয়ে' শব্দটির অর্থ কী?

ক. লয়ে খ. লাভ করে
গ. ভয়-সহকারে ঘ. নির্ভয়ে

৪. ‘শুন’ ধনি, রাজ–কাজ দরিদ্র পালন!’ কথাটি কে কাকে বলেছে?

ক. রসাল স্বর্ণলতিকাকে
খ. রসাল বিধাতাকে
গ. স্বর্ণলতিকা রসালকে
ঘ. স্বর্ণলতিকা বিধাতাকে

নিচের চরণগুলো পড় এবং ৫ নম্বর থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন–বৃক্ষ–কুল–স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!

৫. কবিতাংশটির কবি কে?

ক. সুকুমার রায়
খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. শাহাদাৎ হোসেন
ঘ. ফররুখ আহমদ

৬. কবিতার চরণগুলো দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে–

i. আমগাছের নিজেকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা
ii. আমগাছ বনের সকল গাছের চেয়ে শ্রেষ্ঠ
iii. আমগাছের অহংকারী মনের পরিচয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উর্ধ্বশির যদি তুমি কুল মান ধনে;
করিও না ঘৃণা তবু নিচ–শির জনে।

ক. পঙ্ক্তি দুটির রচয়িতা কে?
খ. উদ্ধৃত অংশটির ভাবার্থ লেখ।
গ. রসালের জন্য পঙ্ক্তি দুটিতে যে বার্তা আছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ‘করিও না ঘৃণা তবু নিচ–শির জনে’ উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে;
শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ, বিধাতারে।
নিদারুণ তিনি অতি;
নাহি দয়া তব প্রতি:
তেঁই ক্ষুদ্র কায়া করি সৃজিলা তোমারে।

ক. স্বর্ণলতিকা কী?
খ. রসাল কেন স্বর্ণলতিকাকে বিধাতাকে নিন্দা করতে বলছে?
গ. রসালের যুক্তির বিষয়ে তোমার মতামত লেখ।
ঘ. উদ্ধৃতাংশে রসালর অহংকারের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

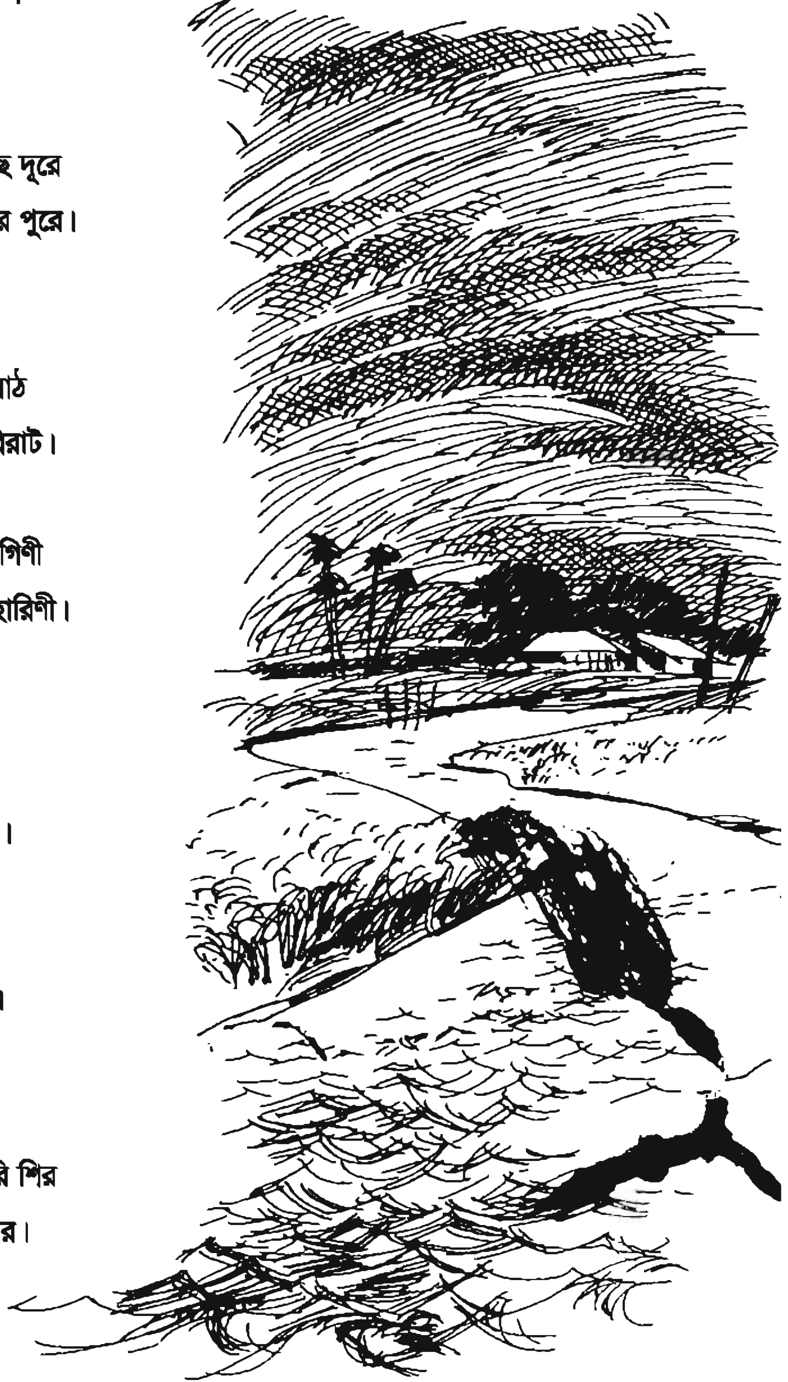
সন্ধ্যা

শাহাদাৎ হোসেন

দিনের আলোক রেখা মিলায়েছে দূরে
নেমে আসে সন্ধ্যা ধীরে ধরণীর পুরে।
তিমির ফেলেছে ছায়া,
ঘিরে আসে কাল মায়া,
প্রান্তর-কানন-গিরি পল্লী বাট মাঠ
একাকার হয়ে আসে আকাশ বিরাট।

থেমে আসে রাখালের বেণুর রাগিণী
বিহঙ্গের কুহু-কেকা, মানস-হারিণী।
কোলাহল কলরব
নীরব হয়েছে সব,
আঁধার নদীর শুধু মৃদু কলগান,
জাগে শুধু সুদূরের স্বপন সমান।

শান্তির পরশ লাগি নত হয় মন
পরিপূর্ণ শুচিতায় আকাশ ভুবন।
এই শুচি শান্তি মাঝে
আজি এ নীরব সাঁঝে
তাঁহারি উদ্দেশে মোরা নত করি শির
দয়ার পয়োধি যিনি স্রষ্টা ধরণীর।



শব্দার্থ ও টীকা

ধরণীর পুরে— পৃথিবীরূপ আলয়ে বা গৃহে।

তিমির— অন্ধকার।

তিমির ফেলেছে ছায়া— অন্ধকারে ঢেকেছে চার দিক।

প্রান্তর— মাঠ।

কানন— বাগান, উদ্যান, বন, উপবন।

গিরি— পর্বত, পাহাড়।

বাট— পথ, রাস্তা।

বেণুর রাগিণী— বাঁশির সুর।

বিহঙ্গ— পাখি।

কুহু— কোকিলের ডাক।

কেকা— ময়ূরের ডাক।

কুহু–কেকা— কোকিল ও ময়ূরের ডাক (এখানে সাধারণভাবে পাখির কলকাকলি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

মানস–হারিণী— মন হরণ করে যে, মনোমুগ্ধকর।

কলগান— জলের কলকল ধ্বনি।

শুচিতা— পবিত্রতা।

ভুবন— পৃথিবী।

শুচি— পবিত্র।

পরিপূর্ণ শুচিতায় আকাশ ভুবন— সমস্ত পৃথিবী ও আকাশে এমন একটা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যাতে সব কিছুই মনে হচ্ছে নির্মল, নীরব ও পবিত্র।

পয়োধি— সমুদ্র।

পাঠ–পরিচিতি

'সন্ধ্যা' কবিতায় চমৎকারভাবে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন দিনের অবসানে সান্ধ্য প্রকৃতির স্নিগ্ধ–শান্ত রূপ।

দিনের আলো নিভে এলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে সন্ধ্যার ছায়া। ক্রমে রাতের আঁধার আচ্ছন্ন করে ফেলে চারপাশ। পল্লী জনপদ, পাহাড় বনানী—সব কিছুই ঢাকা পড়ে কালো অন্ধকারে। রাখালের বাঁশির সুর আর বাজে না, পাখির কলকাকলি থেমে যায়, নীরব হয়ে যায় কর্মক্ষেত্রের কোলাহল। কেবল বহু দূরের আঁধার ঘেরা নদীর বুক থেকে ভেসে–আসা কলসংগীত সৃষ্টি করে স্বপ্নিল পরিবেশ।

সন্ধ্যার এই শান্ত স্নিগ্ধ নীরবতা সমস্ত প্রকৃতিকে এক অনাবিল পবিত্রতায় ভরিয়ে দেয়। নীরব সন্ধ্যায় ঐ পবিত্র পরিবেশে আমাদের মনও আপনা থেকেই নত হয় সেই পরম করুণাময়ের উদ্দেশে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এই জগৎ।

কবি-পরিচিতি

সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করলেও শাহাদাৎ হোসেন প্রধানত কবি ও নাট্যকার হিসেবেই বিশিষ্টতা অর্জন করেন।

কর্মজীবনে কখনো শিক্ষক, কখনো গ্রন্থাগারিক, কখনো সম্পাদক ছিলেন। দীর্ঘ দিন কাজ করেছেন সাংবাদিক হিসেবে। পরে বেতারকেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও শিশুতোষ রচনা মিলিয়ে ত্রিশটির বেশি গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর গ্রন্থগুলো হচ্ছে : 'মোহনভোগ', 'ছেলেদের গল্প', 'বেগম নূরজাহান', 'গুলবদন', 'জাহানারা', 'জেবুন্নেছা', 'বালিকা জীবন', 'সুরুচি পাঠ'।

শাহাদাৎ হোসেনের জন্ম ১৮৯৩ সালে, পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগনা জেলায় পণ্ডিতপোল গ্রামে। ১৯৫৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'তিমির ফেলেছে ছায়া'—কথাগুলো কোন সময়কে নির্দেশ করে?

ক. গোধূলি খ. সন্ধ্যা
গ. রাত ঘ. ঊষা

২. সন্ধ্যার আগমনে কোন ধ্বনি কানে আসে?

ক. বাঁশির সুর খ. কোকিলের ডাক
গ. ময়ূরের ডাক ঘ. নদীর কলগান

৩. সন্ধ্যার শান্ত স্নিগ্ধ নীরবতা সমস্ত প্রকৃতিকে করে তোলে—

i. নীরব
ii. পবিত্র
iii. মনোমুগ্ধকর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের কবিতা–অংশটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তিমির ফেলেছে ছায়া,
ঘিরে আসে কাল মায়া
প্রান্তর–কানন–গিরি পল্লী বাট মাঠ
একাকার হয়ে আসে আকাশ বিরাট।

ক. উদ্ধৃতিটির মধ্যে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে?

খ. 'তিমির ফেলেছে ছায়া, ঘিরে আসে কাল মায়া'—এই অংশটুকুর ভাবার্থ লেখ।

গ. উপরের অংশ অবলম্বনে প্রকৃতির বিশেষ রূপের পরিচয় দাও।

ঘ. উদ্ধৃতাংশে সন্ধ্যাকালীন পল্লীপ্রকৃতির যে স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শান্তির পরশ লাগি নত হয় মন
পরিপূর্ণ শুচিতায় আকাশ ভুবন।
এই শুচি শান্তি মাঝে
আজি এ নীরব সাঁঝে
তাঁহারি উদ্দেশে মোরা নত করি শির

ক. কার উদ্দেশে আমরা মাথা নত করি?

খ. আকাশ ভুবন পরিপূর্ণ রূপে শুচি হয়ে ওঠে কীভাবে?

গ. উদ্ধৃতি অবলম্বনে সন্ধ্যার প্রার্থনার পরিবেশের পরিচয় দাও।

ঘ. উদ্ধৃতাংশে প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যে সাদৃশ্য লক্ষণীয় তা বিশ্লেষণ কর।

বৃষ্টি

ফর্‌রুখ আহমদ



বৃষ্টি এল বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি ।—পদ্মা মেঘনার
দু পাশে আবাদী গ্রামে, বৃষ্টি এল পুবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায় ;
বিদ্যুৎ-রূপসী পরী মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার ।
বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
দিক-দিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার
রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার ।

রুগ্‌ণ বৃদ্ধ ভিখারীর রগ-ওঠা হাতের মতন
রুক্ষ মাঠ অসমান, শোনে সেই বর্ষণের সুর,
তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন,
পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর, বন্ধুর,
যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন
যেখানে বর্ষার মেঘ জাগে আজ বিষণ্ন মেদুর ।



শব্দার্থ ও টীকা

প্রতীক্ষিত— যার জন্যে অপেক্ষা করা হয়েছে এমন।

আবাদী— চাষের উপযুক্ত, চাষের জন্যে তৈরি।

বিদগ্ধ আকাশ— অত্যন্ত শুষ্ক ও তপ্ত আকাশ।

কাজল ছায়ায়— কাজলের মতো কালো মেঘের ছায়ায়।

বিদ্যুৎ-রূপসী পরী— বিদ্যুৎ হচ্ছে এক ঝলক প্রচণ্ড আলোর চমক, মেঘে মেঘে ঘর্ষণে যার সৃষ্টি। কবি এখানে বিদ্যুৎকে কল্পনা করেছেন রূপসী পরী হিসেবে। বাস্তবে পরীর কোনো অস্তিত্ব নেই। রূপকথায় আমরা যে পরীদের কথা জানতে পারি, তারা আসলে কল্পনার সৃষ্টি। রূপকথার গল্প অনুসারে এরা কল্পিত হয়েছে ডানাওয়ালা সুন্দরী নারী হিসেবে। এরা ডানা মেলে আকাশে ভেসে বেড়ায় আর বাস করে কল্পলোকে।

সওয়ার— আরোহী।

বিদ্যুৎ-রূপসী পরী মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার— কবি কল্পনা করেছেন : রুপালি আলোর চমক হেনে বিদ্যুৎ-পরীরা যেন অসংখ্য মেঘের পিঠে সওয়ার হয়ে আকাশে ছুটোছুটি করছে।

বর্ষণ-মুখর দিনে— অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে এমন দিনে।

কেয়া— এক রকম গাছ ও তার ফুল, কেতকী। কেয়া গাছ সাধারণত জলাশয়ের কাছে আর্দ্র মাটিতে জন্মায়। সাধারণত এ জাতীয় গাছে কাণ্ড থেকে ঠেসমূল বের হয়। বর্ষাকালে এই গাছে অসংখ্য ছোট ছোট সুগন্ধী ফুল ফোটে।

শিহরায়— রোমাঞ্চিত হয়।

দিক-দিগন্তের— চার দিকে আকাশ যেখানে মিলেছে বলে মনে হয় এমন দূরাঞ্চলের।

আভা— আলো, দীপ্তি, বর্ণ।

রৌদ্র-দগ্ধ— রোদে পোড়া।

নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার— গ্রীষ্মে প্রচণ্ড সূর্যতাপে নদীর পানি শুকিয়ে যায়। কোথাও কোথাও দেখা যায় ফাটল। কিন্তু বর্ষা নামলে বৃষ্টির স্নিগ্ধ পরশে ফাটল মুছে যায়। বন্যার জল কানায় কানায় ভরে ওঠা নদীর বুক উপচে পড়ে। আর নিয়ে আসে আসন্ন ফসলের অযুত সম্ভাবনা। প্রকৃতিতে নতুন জীবনের সম্ভাবনাময় সমারোহকে কবি দেখেছেন পূর্ণ প্রাণের জোয়ার হিসেবে।

রুগ্ণ বৃদ্ধ ভিখারীর.... শোনে সেই বর্ষণের সুর— কবি এখানে গ্রীষ্মের শুষ্ক, খটখটে ফাটলধরা ফসলের মাঠকে তুলনা করেছেন রুগ্ণ বৃদ্ধ ভিখারীর অস্থিচর্মসার, রগওঠা হাতের সঙ্গে। শুকনো রুক্ষ মাঠ যেন পিপাসিত মন নিয়ে অধীর হয়ে ছিল বৃষ্টির অপেক্ষায়। এখন বৃষ্টি আসায় সে তৃপ্ত মনে শোনে বৃষ্টির রিমঝিম ধ্বনি। এখানে রুক্ষ মাঠের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন কবি। কবিতায় এটি ভাব প্রকাশের একটি সুন্দর রীতি।

তৃষিত— তৃষ্ণার্ত, পিপাসিত।

তৃষাতপ্ত— তৃষ্ণায় আকুল বা পিপাসাকাতর অর্থে ব্যবহৃত।

বন্ধুর— অসমতল, উঁচুনিচু।

তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন— প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রখরতায় সবুজের আধার বনও হয়ে পড়ে নির্জীব। পানির জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে বন-বনানী। গ্রীষ্মের রৌদ্র দাহনে প্রকৃতির মতো মানুষের মনও হয়ে পড়ে তৃষ্ণাকাতর।

বিস্মৃত— ভুলে যাওয়া হয়েছে এমন, মনে নেই এমন।

মেদুর— মৃদু, কোমল, স্নিগ্ধ।

যেখানে বিস্মৃত দিন...... আজ বিষণ্ন মেদুর— বর্ষা কেবল মানুষের তৃষ্ণাকাতর মনে পরিতৃপ্তি এবং অস্বস্তিকর মনে স্নিগ্ধ প্রশান্তি আনে না, তার মনে নানা স্মৃতিও জাগিয়ে তোলে, বহু স্মৃতিতে আচ্ছন্ন পথ বেয়ে তার মনকে নিয়ে যায় অতীতের কোনো বর্ষাস্নাত স্মৃতিময় দিনে। এভাবে আজকের বর্ষার দিনটিতে তার মনে ঢেউ তোলে স্মৃতিময় কোনো দিনের উদাস বিষণ্ন আভাস।

পাঠ–পরিচিতি

'বৃষ্টি' কবিতায় কবি প্রকৃতির বুকে ও মানবমনে বৃষ্টির আবেদনকে ভাষারূপ দিয়েছেন।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপে বাংলার শ্যামল প্রকৃতি যখন হয়ে ওঠে নির্জীব, রুক্ষ ও তৃষ্ণাকাতর, তখন এক সময় হাওয়ার ছন্দে ভর করে নেমে আসে বহুপ্রতীক্ষিত বৃষ্টি। তার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় প্রকৃতি হয় পরিতৃপ্ত। সর্বত্র জাগে প্রাণের শিহরণ। মাঠ, ঘাট, প্রান্তর আর বন–বনানীতে আসে সজীব প্রাণের জোয়ার।

বৃষ্টি কেবল তৃষ্ণার্ত প্রকৃতিকেই পরিতৃপ্তি দেয় না, মানুষের আকুল, অধীর মনেও বৃষ্টি আনে কোমল স্নিগ্ধতার পরশ। আর সেই স্নিগ্ধ কোমল ছোঁয়া লেগে মানুষের মন ওঠে দুলে। সে মন কত না স্মৃতিতে আচ্ছন্ন পথ পেরিয়ে চলে যায় অতীতের স্মৃতিঘেরা কোনো এক বর্ষার দিনে, যেদিনের স্মৃতি এখনও তার মনকে বিভোর করে তোলে বিষণ্ন কোমল উদাস কল্পনায়।

কবি–পরিচিতি

কবি ফররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ সালে ১০ই জুন মাগুরা জেলার মাঝ–আইল গ্রামে। ঐতিহ্যসচেতন কবি হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। কবিতায় আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার নিয়ে তিনি বহু পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেন।

১৯৪৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ, কাব্যনাট্য ও কাহিনীকাব্য প্রকাশিত হয়েছে।

ফররুখ আহমদের কর্মজীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে 'ঢাকা বেতারে'। তিনি শিশু–কিশোরদের জন্যে বেশ কিছু কবিতা ও ছড়া লিখে গেছেন। এগুলো সংকলিত হয়েছে তাঁর 'পাখির বাসা', 'নতুন লেখা', 'হরফের ছড়া', 'ছড়ার আসর' ইত্যাদি গ্রন্থে।

তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ইউনেস্কো পুরস্কার ও মরণোত্তর 'একুশে পদকে' ভূষিত হয়েছেন। ১৯৭৪ সালে ১৯শে অক্টোবর ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফররুখ আহমদ ছিলেন—

ক. সমাজসচেতনতার কবি
খ. প্রকৃতির কবি
গ. ঐতিহ্যসচেতনতার কবি
ঘ. ধর্মীয় অনুভূতির কবি

২. 'বৃষ্টি' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন

ক. গ্রীষ্মকালীন প্রকৃতির রূপ
খ. বর্ষাকালীন প্রকৃতির রূপ
গ. শরৎকালীন প্রকৃতির রূপ
ঘ. হেমন্তকালীন প্রকৃতির রূপ

নিচের অংশটুকু পড়ে ৩–৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

দিক–দিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার
রৌদ্র–দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার।

৩. উদ্বৃতাংশের পূর্বের পঙ্ক্তি—
- ক. বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
- খ. বৃষ্টি এল বহু প্রতিক্ষিত বৃষ্টি। পদ্মা মেঘনার
- গ. বিদ্যুৎ–রূপসী পরী মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার
- ঘ. বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;

৪. ধানখেত বৃষ্টির স্পর্শ পেতে চায় কারণ ধানখেত
- i. গ্রীষ্মের রৌদ্রে দগ্ধীভূত
- ii. বৃষ্টির পরশে শীতল হতে চায়
- iii. বৃষ্টির পানিতে একাকার হতে চায়

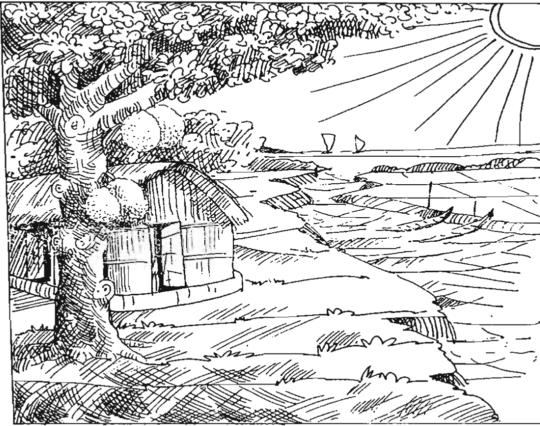
নিচের কোনটি সঠিক?

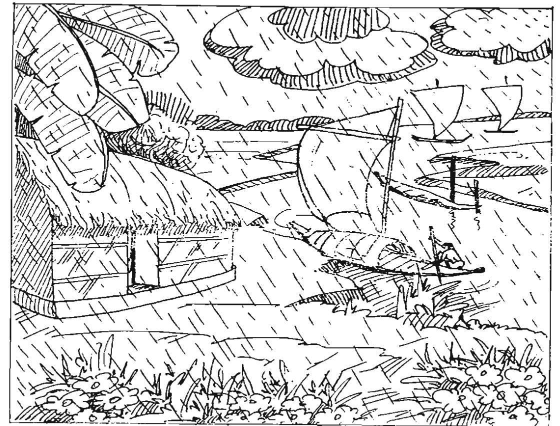
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ঘ. ii ও iii

৫. উদ্ধৃতাংশে ব্যবহৃত হয়েছে—

ক. মিত্রাক্ষর ছন্দ খ. আমিত্রাক্ষর ছন্দ
গ. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ঘ. স্বরবৃত্ত ছন্দ

সৃজনশীল প্রশ্ন


‘ক’ গ্রীষ্মকালীন মাঠের চিত্র


‘খ’ বর্ষার প্রারম্ভের ছবি

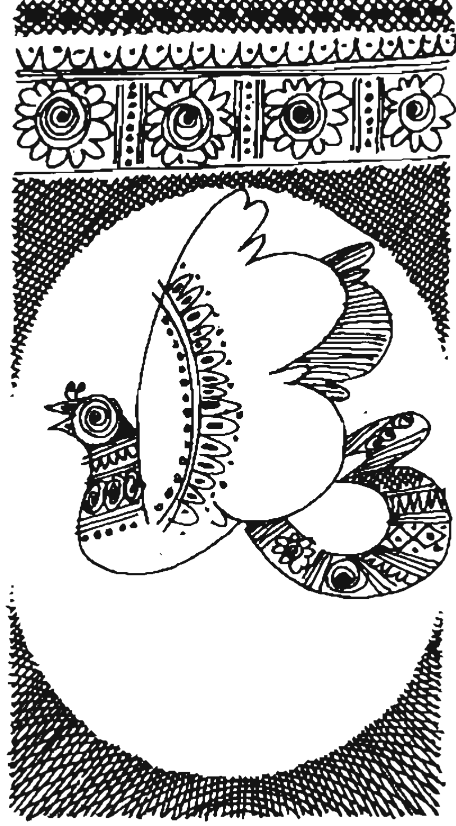
- ক. চিত্র ‘ক’ এবং চিত্র ‘খ’তে কী দেখানো হয়েছে?
- খ. তোমার পঠিত ‘বৃষ্টি’ কবিতার চিত্রকল্পের সঙ্গে উল্লিখিত চিত্র দুটির (ক ও খ) কীরূপ সাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা কর।
- গ. চিত্রে প্রদর্শিত প্রকৃতি মানবমনকে কীভাবে সতেজ করে ‘বৃষ্টি’ কবিতার আলোকে যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
- ঘ. তোমার অভিজ্ঞতার আলোকে বৃষ্টি–পরবর্তী প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

একটি পাখি

শামসুর রাহমান

বহু দূরের পথ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে
এই শহরে আসবে উড়ে
একটি পাখি ভাল।
তার দু চোখে মায়াপুরীর ছায়া আছে,
দূর পাতালের স্বপ্ন আছে,
আছে তারার আলো।

সেই পাখিটা এই শহরে আসবে বলে
পথের ধারে ভিড় জমেছে,
সবাই তাকায় দূরে।
চোখগুলো সব আকাশ পারে বেড়ায় সেই—
মস্ত রঙিন পাখা নেড়ে
আসবে পাখি উড়ে।





রাঙা ঠোঁটের সেই পাখিটা ঝড়ে-কাঁপা
আকাশ ছেড়ে নামবে পথে,
সবাই নেবে পিছু।
সেই পাখিটা স্বর্গপথের নানান গানে
শহরটাকে করবে মধুর,
বলবে খবর কিছু।

কিন্তু কোথায় সেই পাখিটা? এই শহরে
বাজল না তার পাখা দুটি।
আকাশ করে ধু-ধু।
শহরবাসী ক্লান্ত হয়ে ফিরল ঘরে,
সবাই ঘুমে সেই পাখিটার
স্বপ্ন দেখে শুধু।

শব্দার্থ ও টীকা

মায়াপুরী— কল্পলোক, স্বপ্নপুরী।

মায়াপুরীর ছায়া— স্বপ্নপুরী অপূর্ব সুন্দর। সেখানকার জীবন সুখের ও আনন্দের। পাখির চোখে আছে সেই স্বপ্নপুরীর ইশারা।

পাতাল— মাটির নিচের রহস্যময় জগৎ।

দূর পাতালের স্বপ্ন— অনেক বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করে রূপকথার রাজপুত্র পাতালপুরীতে যায়। রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে সে রচনা করে সুখী জীবন। পাখির চোখে সেই সুখময় জীবন রচনার ইঙ্গিত।

তারার আলো— আনন্দময় জীবনের হাতছানি।

স্বর্গপথের নানান গানে— আনন্দময় সুখী জীবনের যাত্রাপথের উজ্জীবন সংগীতে।

বলবে খবর কিছু— সুন্দর ভবিষ্যতের আশ্বাস ও ইঙ্গিত দেবে।

সবাই ঘুমে সেই পাখিটার স্বপ্ন দেখে শুধু— সুখী জীবন লাভের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত হয়তো সফল হয় না। কিন্তু মানুষ সেই প্রত্যাশাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। সুখী–জীবনের স্বপ্ন নিয়ে সে বাঁচে।

পাঠ–পরিচিতি

‘একটি পাখি’ কবিতায় মানুষের সুখী জীবনের প্রত্যাশাকে কবি পাখির প্রতীকে প্রকাশ করেছেন।

বহু দূরের আকাশ–পথ পাড়ি দিয়ে, বন–বনান্তর অতিক্রম করে, দু চোখে স্বপ্নিল মায়া ও বর্ণিল সুখময় জীবনের হাতছানি নিয়ে একটি পাখি আসবে; সেই পাখিটি মানুষের জীবনে নিয়ে আসবে সুখময়, আনন্দময় জীবনের নতুন আশ্বাস—এ প্রত্যাশায় পথের ধারে ভিড় জমেছে শহরবাসী লোকের। সবারই চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে—কখন সেই পাখি উড়ে আসবে আকাশপথে। কিন্তু আশার আলো নিয়ে সেই রঙিন পাখি এল না। দীর্ঘ অপেক্ষায় তাকিয়ে থেকে এক সময় ক্লান্ত–শ্রান্ত নগরবাসী ঘরে ফিরল গভীর হতাশা নিয়ে। আর ধু–ধু আকাশে ছড়িয়ে রইল হতাশার বিশাল শূন্যতা।

সুখ নামের পাখিটি আসে না, কিন্তু তবু মানুষের আশার শেষ হয় না। তাদের স্বপ্ন–কল্পনায় নিরন্তর অনুরণিত হতে থাকে সুখের আশ্বাসের প্রতীক সেই রঙিন পাখির জন্যে প্রত্যাশা।

কবি–পরিচিতি

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের এক জন প্রধান কবি। নাগরিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, গণ–আন্দোলন তাঁর কবিতায় নানা অনুভূতিতে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর কবিতা তাই দেশপ্রেম ও সামাজিক সচেতনতায় সতেজ ও দীপ্ত।

শামসুর রাহমান পেশায় সাংবাদিক ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ‘মর্নিং নিউজ’, ‘রেডিও বাংলাদেশ’, ‘দৈনিক গণশক্তি’ ইত্যাদি পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় এক দশক তিনি ছিলেন ‘দৈনিক বাংলা’র সম্পাদক।

এ পর্যন্ত তাঁর ৪০টিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এ ছাড়া উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথাও লিখেছেন তিনি। শিশুদের জন্যও শামসুর রাহমান চমৎকার কবিতা লিখেছেন। ‘এলাটিং বেলাটিং’, ‘ধান ভানলে কুঁড়ো দেব’, ‘গোলাপ ফোটে খুকির হাতে’ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য ছড়া ও কবিতার বই।

সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে এই জননন্দিত কবি বেশ কিছু পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, মিতসুবিশি পুরস্কার ইত্যাদি।

শামসুর রাহমানের জন্ম ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর ঢাকায়। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর পাহাড়তলী গ্রামে।

তিনি ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি কবি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ?

ক. দুঃসময়ের মুখোমুখি খ. সাঁঝের মায়া

গ. রূপসী বাংলা ঘ. কখনো রং কখনো সুর

২. 'পাখি' প্রতীকটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. স্বপ্নিল মায়া খ. সুখময় জীবন

গ. সুখের প্রত্যাশা ঘ. বিশাল শূন্যতা

উদ্ধৃতিটি পড় এবং ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্বপ্নপুরীর ইশারা নিয়ে সুখপাখিটি আসে না। কিন্তু সময়ক্লান্ত নগরবাসী প্রত্যাশার স্বপ্ন দেখে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় পার করে দেয়। চারিদিকে থাকে হতাশার বিশাল শূন্যতা।

৩. 'স্বপ্নপুরীর ইশারা' বলতে কী বোঝায়?

ক. সুখী ও আনন্দময় জীবনের ইঙ্গিত

খ. কল্পলোকের মায়াবী ছোঁয়া

গ. স্বর্গের স্বপ্নমাখা ছোঁয়া

ঘ. মিথ্যা প্রতারণা

৪. উদ্ধৃত অংশের সমাপ্তিসূচক বক্তব্য কী?

ক. নগরবাসীর প্রত্যাশা কখনো পূরণ হয় না

খ. সুখী জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে পাখি আসে

গ. এই দূরের পাখি সুখের প্রতীক

ঘ. জীবনের স্বপ্ন নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে

৫. পাখির জন্য প্রত্যাশা কার?

ক. নগরবাসীর খ. গ্রামবাসীর

গ. দেশবাসীর ঘ. দরিদ্র জনগণের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

সুখময় বর্ণময় জীবনের প্রত্যাশা বিরাজমান প্রতিটি মানুষের মধ্যে। দুঃখ, দারিদ্র্য, হতাশা, গ্লানি যখন মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তোলে তখন মানুষ স্বপ্ন ও কল্পনায় সুখের আশ্বাস খোঁজে। এই প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত হয়তো পূরণ হয় না, কিন্তু রঙিন স্বপ্ন নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে।

ক. সুখময় জীবনের প্রত্যাশাকে কবি শামসুর রাহমান কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

খ. 'মানুষ স্বপ্ন ও কল্পনায় সুখের আশ্বাস খোঁজে' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদের বর্ণনার সাথে তোমার পঠিত 'একটি পাখি' কবিতার বক্তব্যের কতটুকু মিল আছে—বর্ণনা কর।

ঘ. 'রঙিন স্বপ্ন নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে' উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. কবিতাংশটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

বহু দূরের পথ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে,
এই শহরে আসবে উড়ে
একটি পাখি ভালো।
তার দু চোখে মায়াপুরীর ছায়া আছে,
দূর পাতালের স্বপ্ন আছে,
আছে তারার আলো।

ক. কবিতাংশটুকু কোন কবির রচনা?

খ. 'পাখি' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তার আগমনের কারণ কী—বুঝিয়ে লেখ।

গ. 'উদ্দীপকে যে বর্ণনা দেওয়া আছে তার বাস্তবায়ন হলে শহরের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে' মন্তব্যটি নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিতাংশটির বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

ছিন্ন মুকুল

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



সবচেয়ে যে ছোট পিঁড়িখানি
　　　　সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোট থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
　　　　জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে;
বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট
　　　　খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
　　　　তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সবচেয়ে যে অল্পে ছিল খুশি,
　　　　খুশি ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
　　　　দিয়ে গেছে জায়গা খালি করে,
ছেড়ে গেছে পুতুল, পুঁতির মালা,
　　　　ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি;
ভয়-তরাসে ছিল যে সবচেয়ে
　　　　সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি।

হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে, ওরে!
হারিয়ে গেছে বোল্‌-বলা সেই বাঁশি,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি,
দুধে-ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি;
ঢুকেছে হায় শ্মশান ঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশানবাসী!

সবচেয়ে যে ছোট কাপড়গুলি,
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে;
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোট
আজকে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে।
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সবচেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।

শব্দার্থ ও টীকা

পিঁড়ি— কাঠের ছোট নিচু আসন।

ভয়-তরাসে ছিল যে সবচেয়ে— সামান্য কারণেই যে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ত।

আঁধার ঘরের চাবি— মৃত্যুরূপ অন্ধকার ঘরের চাবি।

ভয়-তরাসে ছিল যে সব চেয়ে, সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি— যে অন্ধকারে একা থাকতে ভয় পেত, সে-ই মৃত্যুরূপ অন্ধকার ঘরের চাবি খুলে তার ভেতর চিরতরে আশ্রয় নিয়েছে।

বোল— ধ্বনি, শিশুর আধো আধো কথা।

বোল্‌-বলা সেই বাঁশি— শিশুর আধো আধো বোল বলা সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর। শিশুর কণ্ঠস্বর শুনলে মনে হত যেন বাঁশি থেকে সুর বের হচ্ছে।

দুধে-ধোয়া— দুধের মতো সাদা রঙের।

শ্মশান— মৃতদেহ দাহ করার স্থান।

ঢুকেছে হায় শ্মশান ঘরের মাঝে, ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশানবাসী— প্রিয়জনের স্নেহ-মমতা ভরা ঘর ছেড়ে শিশু চলে গেছে শ্মশানে। প্রিয়জনের মমতাময় হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে শ্মশানের কঠিন নিষ্ঠুরতা।

শ্মশানবাসী— শ্মশানে বসবাসকারী।

ছোট্ট যে জন ছিল রে সবচেয়ে, সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে— সংসার ও হৃদয়ের এক কোণে জায়গা করে নিয়েছিল ছোট্ট শিশুটি। সে আজ নেই; অন্য সবাই থাকলেও সমস্ত ঘরই যেন শূন্য হয়ে গেছে।

পাঠ–পরিচিতি

ছোট শিশু আর শিশুমন অনাবিল হাসি ও প্রাণচঞ্চল সজীবতা দিয়ে আমাদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। আমাদের অনেক শূন্যতাকে ভরিয়ে তোলে সে তার আবেগ ও মাধুর্য দিয়ে। তার অকালমৃত্যুতেই কেবল আমরা অনুভব করতে পারি—তাকে হারানোর বেদনা কত তীব্র, কত মর্মান্তিক।

'ছিন্ন মুকুল' কবিতাটি এমনি এক শিশুর অকালমৃত্যুর বেদনায় ভরা। শিশুটির স্মৃতি ছড়িয়ে আছে তার রেখে–যাওয়া আদরের ছোট পিঁড়ি, ছোট থালা, ছোট গেলাসে। যাকে না খাইয়ে কেউ খেতে বসত না, তাকে না খাইয়ে এখন যখন সবাইকে খেতে হয়, তখন মর্মান্তিক দুঃখে ভরে যায় মন।

যে শিশু ছিল অল্পে সন্তুষ্ট, প্রিয় খেলনা আর মায়ের কোলের দাবি—সব ত্যাগ করে সে চলে গেছে চিরতরে। সে থাকত সবার গা ঘেঁষে, অন্ধকারে একলা থাকতে ভয় পেত, সে চলে গেছে সবাইকে ছেড়ে একলা, চলে গেছে একাকী মহা অন্ধকারময় মৃত্যুঘরের চাবি খুলে। তার আধো আধো সুললিত মধুর কথা আর শোনা যায় না। তার দুধে–ধোয়া দাঁতের হাসি হারিয়ে গেছে চিরতরে। প্রিয়জনের মমতার ঘর ছেড়ে সে চলে গেছে শ্মশানঘরের অজানা লোকে।

তার ছোট কাপড় আর রোদে মেলা হয় না। তার ছোট বিছানা এখন শূন্য। সে এসেছিল সবার শেষে, কিন্তু চলে গেছে সবার আগে। ঘরের সামান্য একটু জায়গা নিয়ে সে থাকত। কিন্তু সে চলে যাওয়ায় এখন সারা ঘর জুড়ে শূন্যতার হাহাকার। শূন্যতার হাহাকার প্রিয়জনদের অন্তর জুড়ে।

কবি–পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যে 'ছন্দের জাদুকর' হিসেবে খ্যাত। নানা ছন্দে তিনি কবিতা লিখেছেন এবং বাংলা ও বিদেশী নানা ছন্দ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন, নতুন নতুন ছন্দ আবিষ্কার করেছেন।

কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্র অনুসারী কবি। কিন্তু কবিতায় ছন্দের বৈচিত্র্য এনে তিনি বাংলা কাব্যে পৃথক স্থান করে নেন। তিনি আরবি, ফারসি, ইংরেজিসহ অনেকগুলো ভাষা জানতেন। বাংলা ভাষায় তিনি প্রচুর অনুবাদ কবিতা রচনা করেন। তিনি পবিত্র কোরানের বাণীকে বাংলা কবিতায় রূপ দিয়ে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন এবং অনেকগুলো বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেছেন। উপন্যাস, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা এবং অনুবাদ করলেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবি হিসেবেই সুপরিচিত। তাঁর প্রায় ১৬টি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। শিশু ও কিশোরদের জন্যে লেখা তাঁর কবিতাগুলো 'শিশু কবিতা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর জন্ম ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ছোট্ট পিঁড়িখানি কেউ পেতে রাখে না কারণ শিশুটি
   - ক. বেড়াতে গেছে
   - খ. মারা গেছে
   - গ. লুকিয়ে আছে
   - ঘ. স্কুলে গেছে

২. বাড়ির সবচেয়ে যে ছোট তাকে কেউ খেতে ডাকে না কেন?
   - ক. তার খাওয়া হয়ে গেছে
   - খ. তার ক্ষুধা নাই
   - গ. সে ঘুমিয়ে পড়েছে
   - ঘ. তার মৃত্যু হয়েছে

৩. ভয়–তরাসে ছিল যে সবচেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি
এখানে 'আঁধার ঘর' বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. অন্ধকার ঘর
খ. আলোকবিহীন ঘর
গ. কবরস্থান
ঘ. মৃত্যুরূপ অন্ধকার ঘর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রহিম সাহেবের ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল। মেয়েকে নিয়ে তার পরিবারে আনন্দের সীমা ছিল না। হঠাৎ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মেয়েটি মারা যায়। মেয়ে নেই রয়েছে তার স্মৃতি। এখন মেয়ের ব্যবহৃত থালা, বাটি, গেলাস, বিছানা, পুতুল, মালা, কাপড়–চোপড় নিয়ে তারা স্মৃতিচারণ করে। ঘরের সর্বত্রই মেয়ের স্মৃতি। স্মৃতি তাদের সর্বদা তাড়িত করে।

ক. উল্লিখিত অনুচ্ছেদে ছোট শিশুর কোন কোন জিনিস তার মৃত্যুর বেদনাময় স্মৃতি বহন করে?
খ. ছোট শিশুর স্মৃতি পিতামাতাকে কীভাবে তাড়িত করে তা ব্যাখ্যা কর।
গ. উল্লিখিত অনুচ্ছেদে যে মর্মকথা প্রকাশ পেয়েছে তার সাথে তোমার পঠিত 'ছিন্ন মুকুল' কবিতার যে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মেয়ে নেই রয়েছে তার স্মৃতি' উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে
ছোট্ট যে জন ছিল রে সবচেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।

ক. উল্লিখিত চরণ কয়টি কোন কবির লেখা?
খ. 'সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল সেই গিয়েছে সবার আগে সরে'–ব্যাখ্যা কর।
গ. ছোট শিশুর অকালমৃত্যু মানুষকে কীভাবে পীড়া দেয়—যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
ঘ. 'সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে' কথাগুলো বিশ্লেষণ কর।



আমার এ দেশ

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা



আমার এ দেশে
যেখানে উর্বর মাটিতে অঙ্কুর মাথা তোলে
ভাঙ্গা দেয়ালের ফাটলেও বুনো লতায় ধরে ফুল
শালিক ময়নার ঝাঁক উড়ে আসে ধানখেতে
বনবনান্তে পাখিরা গান গায়,
        শাখায় শাখায় উড়ে উড়ে চলে।
বধূ শিশুকে নাচায়
খঞ্জন নাচে আঙিনায়
কৃষাণী সোনার ধানে ভরে গোলা
হর্ষে বেজে ওঠে হাতের কাঁকন।
        বৈকালের হলুদ রোদে
        চুল এলিয়ে বসে তরকারি কুটে কুটে রাখে টুকরিতে
        কেউবা বানায় নানারকম পিঠে।
নদীর রুপালি জলে দিন শেষে
        সোনা রং ঝিকমিক করে
গড়ে তোলে যেন রূপকথার রাজ্য
সন্ধ্যা নেমে আসে
রাখালের ক্লান্ত বাঁশি থামে
        ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে
        সন্ধ্যার প্রদীপ।
এই যে সুন্দর মায়াপুরী
এ আমার দেশ।

শব্দার্থ ও টীকা

উর্বর– প্রচুর উৎপাদন করতে পারে এমন।

অঙ্কুর– বীজ থেকে প্রথম যা বের হয়।

হর্ষ– আনন্দ, পুলক।

কাঁকন– মেয়েদের এক ধরনের অলংকার, কঙ্কন।

পাঠ–পরিচিতি

এদেশের উর্বর প্রকৃতি ফুল–ফলে শোভিত। পাখ–পাখালির কলকাকলিতে মুখরিত। জননীর পরম স্নেহে বেড়ে ওঠে শিশুরা। গ্রামে গ্রামে কৃষাণীরা কর্মচঞ্চল করে তোলে জীবনকে। দিনের শেষে রুপালি নদী সোনা রঙে ঝিলমিল করে। মনে হয়, রূপকথার রাজ্যে নেমে আসে সন্ধ্যা। রাখালের ক্লান্ত বাঁশির সুর মিলিয়ে যায় দূরে। ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যাপ্রদীপ। এদেশ হয়ে ওঠে মায়াপুরী।

কবি–পরিচিতি

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা অল্প বয়সে পত্র–পত্রিকায় কবিতা লিখে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির রূপ–বৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ আছে। আছে মানুষের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনার আন্তরিক প্রকাশ।

কুসংস্কার, পর্দাপ্রথা ও অশিক্ষাকে তিনি নারীর মানুষ হওয়ার পথে বাধা হিসেবে দেখেছেন। 'পশারিণী' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এর আগে আর কোনো বাঙালি মুসলমান মহিলা কবির কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার জন্ম ১৯০৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাবনা শহরে। ১৯৭৭ সালের ২রা মে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আঙিনায় কী নাচে?

ক. শালিক   খ. কাক

গ. ময়না   ঘ. খঞ্জন

২. আমার এ দেশ কবিতার মূল উপজীব্য–

ক. বাংলার প্রকৃতি   খ. শহুরে জীবন

গ. গ্রামীণ জীবন   ঘ. বাংলার ঐতিহ্য

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুজলা, সুফলা, শস্য–শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ, অপূর্ব এদেশের প্রকৃতি। কর্মচঞ্চল দিনশেষে রুপালি নদী সোনারঙে ঝিলমিল করে। নেমে আসে সন্ধ্যা। এদেশে তাই গ্রামবাংলার জীবনবৈচিত্র্য সকলকেই আকর্ষণ করে। কবি বলেছেন

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।"

ক. উদ্ধৃত অংশটিতে কী উপস্থাপন করা হয়েছে?

খ. গ্রামবাংলার সন্ধ্যা নামার দৃশ্যটি বর্ণনা কর।

গ. 'আমার এ দেশ' কবিতার মূল বক্তব্যের সাথে উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের যে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২. ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে
সন্ধ্যার প্রদীপ
এই সে সুন্দর মায়াপুরী
এ আমার দেশ।

ক. উপরের পঙ্‌ক্তিগুলো কোন কবিতার অংশ?

খ. আমাদের দেশকে মায়াপুরী বলা হয়েছে কেন?

গ. সন্ধ্যাকালীন সময় তোমার বাড়ির একটি বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আমাদের গ্রামীণ জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।



মানুষের সেবা

আবদুল কাদির

হাশরের দিন বলিবেন খোদা—হে আদম সন্তান
তুমি মোরে সেবা কর নাই যবে ছিনু রোগে অজ্ঞান।
মানুষ বলিবে—তুমি প্রভু করতার,
আমরা কেমনে লইব তোমার পরিচর্যার ভার ?
বলিবেন খোদা—দেখনি মানুষ কেঁদেছে রোগের ঘোরে,
তারি শুশ্রূষা করিলে তুমি যে সেথায় পাইতে মোরে।

খোদা বলিবেন—হে আদম সন্তান,
আমি চেয়েছিনু ক্ষুধায় অন্ন, তুমি কর নাই দান।
মানুষ বলিবে—তুমি জগতের প্রভু,
আমরা কেমনে খাওয়াব তোমারে, সে কাজ কি হয় কভু ?
বলিবেন খোদা—ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে তুমি ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াইতে তারে।

পুনরপি খোদা বলিবেন—শোন হে আদম সন্তান,
পিপাসিত হয়ে গিয়েছিনু আমি, করাওনি জল পান।
মানুষ বলিবে—তুমি জগতের স্বামী,
তোমারে কেমনে পিয়াইব বারি, অধম বান্দা আমি ?
বলিবেন খোদা—তৃষ্ণার্ত তোমা ডেকেছিল জল আশে,
তারে যদি জল দিতে তুমি তাহা পাইতে আমার পাশে।

শব্দার্থ ও টীকা

হাশরের দিন— শেষ বিচারের দিন, কেয়ামতের ধ্বংসের পর পাপ–পুণ্যের বিচারের জন্য মানুষের পুনরুত্থানের দিন।

আদম— ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মমতে সৃষ্টির প্রথম মানুষ, মানুষের আদি পিতা।

আদম সন্তান— আদমের বংশধর, মানুষ।

ছিনু— ছিলাম।

করতার— স্রষ্টা, আল্লাহ্।

শুশ্রূষা— রোগীর সেবা বা পরিচর্যা।

পুনরপি— আবারও, পুনর্বার, পুনশ্চ।

জগতের স্বামী— জগতের অধিপতি, বিশ্বপতি, স্রষ্টা।

বারি— পানি, জল।

পিয়াইব— পান করাব।

তৃষ্ণার্ত— পিয়াসী, পিপাসার্ত।

আশে— আশায়, প্রত্যাশায়।

পাঠ–পরিচিতি

'মানুষের সেবা' কবিতায় কবি মানুষের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে মানবসেবার গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে কেবল স্রষ্টার বন্দনা করলেই যে স্রষ্টাকে খুশি করা যায়, তা নয়।

মানুষের ধর্মসাধনায় প্রকৃত সাফল্য আসে দীনহীন মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে। এতেই স্রষ্টা সন্তুষ্ট হন এবং মানবজীবনের সাফল্য অর্জিত হয়।

রোগকাতর মানুষের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে, নিরন্ন মানুষকে ক্ষুধার অন্ন জুগিয়ে, তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মিটিয়েই মানুষ স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আর্ত–পীড়িত মানবতার পাশে সেবা ও কল্যাণের হাত যে বাড়িয়ে দেয়, সে-ই আসলে প্রকৃত পুণ্য অর্জন করে।

কবি–পরিচিতি

আবদুল কাদিরের জন্ম ১লা জুন ১৯০৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আড়াইসিন্ধা গ্রামে। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন 'মাহেনও' পত্রিকার সম্পাদক ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রকাশনা কর্মকর্তা।

'দিলরুবা' নামে তাঁর বিখ্যাত একটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থ ও বেশ কিছু প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ছন্দের ওপর তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। ছন্দ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'ছান্দসিক কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। নজরুল ও রোকেয়া রচনাবলিসহ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি নজরুল গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৯৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে তিনি 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' ও 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কারে' সম্মানিত হয়েছেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন দিন খোদা আমাদের জিজ্ঞেস করবেন?

ক. মৃত্যুর দিন খ. জন্মের দিন
গ. হাশরের দিন ঘ. কেয়ামতের দিন

নিচের অংশটুকু পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাদার তেরেসা ছিলেন এক অসাধারণ মানবদরদি। গরিব এবং অসুস্থ মানুষের সেবার জন্য বিভিন্ন দেশে গড়েছিলেন মিশনারিজ অব চ্যারিটি। এই মানবসেবা সংঘের মাধ্যমে তিনি মৃত্যুমুখী অসহায় মানুষ, অনাথ শিশু, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু, কুষ্ঠরোগীদের সেবা দিয়েছেন।

১. 'মানুষের সেবা' কবিতার আলোকে বলা যায় মাদার তেরেসা হচ্ছেন—

i. স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনকারী মানুষ
ii. সম্পদশালী একজন সফল মানুষ
iii. প্রকৃত পুণ্য অর্জনকারী মানুষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

২. 'মানুষের সেবা' কবিতার আলোকে বলা যায় মাদার তেরেসার মতো মানুষ পায় খোদার—

ক. ভালোবাসা খ. করুণা
গ. সান্নিধ্য ঘ. ঘৃণা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রমিত তার বাবার সাথে ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। পথের পাশে শীতে কুঁকড়ে থাকা এক পথশিশুকে দেখে রমিত তার বাবাকে বলল, "বাবা, এই শিশুটির জন্য কি আমরা কিছু করতে পারি না"? তার বাবা বলল, "তুমি কী করতে চাও।" রমিত প্রতিউত্তরে বলল, "আমি চাই আপাতত ছেলেটি শীতের এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাক" রমিতের বাবা পরম স্নেহে পথশিশুটিকে কাছে ডেকে নিল এবং তাকে পাশের মার্কেট থেকে গরম কাপড় ও একটি কম্বল কিনে দিল। রমিতের এ সেবামূলক আচরণে তার বাবা খুবই আনন্দিত হল। কারণ মানুষকে ভালোবাসলেই আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ করা যায়।

ক. রাস্তায় রমিত বাবার নিকট কী অনুরোধ করল?
খ. রমিতের মর্মপীড়ার কারণ বর্ণনা কর।
গ. উদ্ধৃতাংশের সাথে 'মানুষের সেবা' কবিতার মর্মকথার কী সাদৃশ্য লক্ষণীয়? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
ঘ. মানুষকে ভালোবাসলেই আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ করা যায় মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

মানা

সিকান্দার আবু জাফর

হাটে–মাঠে–গঞ্জে–ঘাটে সুদূর গাঁয়ের পথে
নদীর তীরে, বালুর চরে, সমুদ্র সৈকতে
ছড়িয়ে আছে জীবন যেন আনন্দে আটখানা
তুমিই যে তার ভাগ নেবে না তোমার শুধু মানা।

ও–জঙ্গলে দোয়েল নাচে, শালিখ ডাকে গাছে
ঘুঘুর ছানা মিটমিটিয়ে হয়তো চেয়ে আছে
বুলবুলিটার লাল টুপিটা দেখার নেশায় মেতে,
টুনটুনি–বৌ অবাক হয়ে রাখে দু চোখ পেতে,
ও–জঙ্গলে বাতাস মিঠে, মিঠে ফুলের হাসি
তারও চেয়ে মধুর মিঠে বাঁশের পাতার বাঁশি
তবুও তোমার ও–দিকটাতে যেতে বিষম মানা,
ছাতিম গাছে লুকিয়ে আছে মুণ্ডু কাটা ডানা।

সাগর দিঘির তীরে তীরে ধান সবুজের মেলা
কচি ধানের হাজার শীষে সোনা রোদের খেলা।
ফড়িং–পায়ের নাচন কেড়ে নাচে মেঘের মায়া।
জল–পুকুরে আকাশ দেখে নিজের সুনীল কায়া।
মাছরাঙা তার রাঙা ঠোঁটের পরখ করে ধার
সাগর–দিঘির চতুর্দিকে খোলা খুশির দ্বার,
তবু তোমার ও–দিকটাতে যেতে বিষম মানা
জলের দানো হঠাৎ রেগে দিতেই পারে হানা।

দক্ষিণে যাও বারণ আছে, পশ্চিমে যাও মানা
উত্তরে যাও নিষেধ আছে, পুবে আগল টানা।
সবাই যখন হাসে–খেলে বন্ধ তোমার খেলা
একলা তোমার চতুর্দিকেই ভয়ের থাবা মেলা।

পালিয়ে যাবে কেবল তখন হার মেনে সব মানা
তুমি যখন সাহস করে হবে হার–না–মানা।

শব্দার্থ ও টীকা

সৈকত— বেলাভূমি, সমুদ্র, নদী প্রভৃতির বালুময় তীর।
বিষম— দারুণ, সাংঘাতিক।
মুণ্ডু— মাথা, মস্তক।
পরখ— পরীক্ষা, যাচাই, বিচার।
দানো— দানব, ভূতপ্রেত।
আগল— দরজার খিল, বাধা, প্রতিবন্ধক।

পাঠ-পরিচিতি

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবনের কর্মপরিমণ্ডলের বৈচিত্র্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অপার আনন্দ। তা থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন কখনো সার্থক হয়ে ওঠে না।

বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতির আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে নানা সৌন্দর্য ও নানা আকর্ষণ। নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে বন্দি মানুষ বঞ্চিত হয় পাখপাখালির লীলায়িত ভঙ্গি আর কলকাকলি থেকে। সাগর দিঘির স্বচ্ছ পানি, মাঠের সবুজে সোনারোদের হাসি কিংবা জলপুকুরের আয়নায় পড়া সুনীল আকাশের নীলাভ আভা যে রূপের হাতছানি দেয়, তার সৌন্দর্য সে অনুভব করবে কী করে? সেই পথ আগলে ধরে জলের দানোর আতঙ্ক।

বিধি-নিষেধের বেড়াজালে যে মন বন্দি, সে কখনো বেড়াজাল ঘোচাতে পারে না। অদৃশ্য এক মহাভয় দেয়াল দিয়ে থাকে তার চারপাশের পথে।

এক বার সাহস করে সে বেড়াজাল ভাঙতে পারলে পাওয়া যায় মুক্ত জীবনের আনন্দ। নানা সৌন্দর্যের সঙ্গে ঘটে পরিচয়।

কবি-পরিচিতি

এদেশের সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও সাহিত্য সংগঠক সিকান্দার আবু জাফর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার, নাট্যকার, গল্পকার ও সাংবাদিক।

সিকান্দার আবু জাফরের জন্ম খুলনার তেঁতুলিয়া গ্রামে ১৯১৯ সালে। কর্মজীবনে তিনি প্রধানত সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। পরে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর সহযোগী সম্পাদক ও 'দৈনিক মিল্লাত'-এর প্রধান সম্পাদক হন। 'সমকাল' নামে একটি প্রগতিশীল সাহিত্য মাসিকের প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘ তেরো বছর পর্যন্ত এর সম্পাদনা তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় দিক। তাঁর রচিত 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' গানটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছিল।

তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তিনটি উপন্যাস, সাতটি কাব্যগ্রন্থ ও একাধিক নাটক। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে—কিশোর উপন্যাস 'জয়ের পথে' ও জীবনী গ্রন্থ 'নবী কাহিনী'।

সিকান্দার আবু জাফর ১৯৭৫ সালের ৫ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

তবুও তোমার ও–দিকটাতে যেতে বিষম মানা
নিচের কোনটি উদ্ধৃত লাইনের পরবর্তী লাইন—

ক. ছড়িয়ে আছে জীবন যেন আনন্দে আটখানা
খ. ছাতিম গাছে লুকিয়ে আছে মুণ্ডু কাটা ডানা।
গ. তুমিই যে তার ভাগ নেবে না তোমার শুধু মানা
ঘ. পালিয়ে যাবে কেবল তখন হার মেনে সব মানা

নিচের অংশটুকু পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাগর দিঘির তীরে তীরে ধান সবুজের মেলা,
কচি ধানের হাজার শীষে সোনা রোদের খেলা।

২. 'সাগর দিঘি' বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. ছোট দিঘি
খ. বিশাল দিঘি
গ. দিঘির ন্যায় সাগর
ঘ. গভীর দিঘি

৩. উদ্ধৃতাংশটি যে চিত্রকল্প তুলে ধরে তা হচ্ছে—

i. বিস্তৃত জলাশয় ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল পাকা ধানের মাঠ
ii. বিস্তৃত জলাশয় ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল কাঁচা ধানের মাঠ
iii. বিস্তৃত জলাশয় ও সবুজ ঘাসের মাঠ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রমিত পারিবারিক বনভোজনে কক্সবাজার গিয়েছে। সেখানে তার এক চাচাতো ভাই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ভ্রমণ করার প্রস্তাব দিল। তার অন্যান্য ভাইবোনেরা সমস্বরে তাকে সমর্থন দিল। কিন্তু রমিতের চারিদিকে ভয়ের থাবা। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেঙে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ যাওয়ার ব্যাপারে রমিতের এক ধরনের ভীতি কাজ করে। তাই সে অন্যান্য ভাইবোনের সঙ্গী হয়ে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ না গিয়ে হোটেলে শুয়ে থাকে। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে রমিতের ভাইবোনেরা ফিরে এসে রমিতকে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলল। রমিত তাদের কথা শুনে আফসোস করল যে শুধুমাত্র ভয়কে জয় না করতে পারার জন্য প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য উপভোগ করা গেল না।

ক. 'মানা' কবিতায় কবির চোখে কী কী মিঠে মনে হয়?
খ. রমিতের চারিদিকে ভয়ের থাবা কথাটি 'মানা' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
গ. রমিতের মতো ছেলেরা কতটুকু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে বলে তুমি মনে কর। 'মানা' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মুক্ত জীবনযাপনের জন্য ভয়কে জয় করার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

নন্দলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে যে করেই হোক রাখিবেই সে জীবন
সকলে বলিল, "আহা হা, কর কী, কর কী, নন্দলাল ?"
নন্দ বলিল, "বসিয়া বসিয়া রহিব কি চির কাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ"
তখন সকলে কহিল, "বাহবা, বাহবা, বাহবা, বেশ।"

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কে বা ?
সকলে বলিল, "যাও না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা।"
নন্দ বলিল, "ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম, কিন্তু, অভাগা দেশের হইবে কী ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখ চারি দিক।"
তখন সকলে বলিল, "হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে, ঠিক।"

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির—
গালি দিয়া সব গদ্যে–পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িল ধন্য, দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন—
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশ গুণ।
খাইতে ধরিল লুচি আর ছোঁকা, সন্দেশ থাল-থাল—
তখন সকলে বলিল, "বাহবা, বাহবা, নন্দলাল।"

নন্দ বাড়ির হত না বাহির, কোথা কী ঘটে কি জানি,
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি।
নৌকা ফি–সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়,
হাঁটিলে সর্প, কুক্কুর, আর গাড়ি–চাপা পড়া ভয়।
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল, "ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চির কাল।"

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

ভীষণ পণ— ভয়ানক প্রতিজ্ঞা, দুর্দান্ত শপথ, দৃঢ় সংকল্প।

স্বদেশের তরে যে করেই হোক রাখিবেই সে জীবন— দেশের কাজ করার জন্যে দেশপ্রেমিক মানুষ জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু নন্দলালের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—যে-কোনো ভাবেই হোক তাকে জীবন রক্ষা করতে হবে। বেঁচে না থাকলে দেশের সেবা সে করবে কী করে!

উদ্ধার— রক্ষা, বিপদ থেকে বাঁচানো, পরিত্রাণ।

জাহির— বেশি বেশি করে প্রচার ও প্রদর্শনপ্রবণতা।

ছোঁকা— ছেঁচকি, আলু ও কুমড়ো দিয়ে রান্না এক রকমের তরকারি।

ফি-সন— প্রতি বছর।

কলিশন— সংঘর্ষ।

ভ্যালা— ভালো শব্দের বিদ্রূপাত্মক বিকৃত রূপ।

পাঠ-পরিচিতি

'নন্দলাল' কবিতাটি হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি উৎকৃষ্ট ও অনবদ্য ব্যঙ্গকবিতা। এ কবিতায় তিনি মানুষের আচরণের তির্যক সমালোচনা করেছেন এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে দেশপ্রেমের নামে বুলিসর্বস্ব মানুষের ভণ্ডামির স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

এক ধরনের লোক আছে যারা মুখে দেশদরদি, বড় বড় বুলি কপচায়, কিন্তু বাস্তবে দেশ, জাতি এমনকি নিজের ভাইয়ের জন্য সামান্যতম ত্যাগও স্বীকার করে না। 'নন্দলাল' কবিতায় নন্দলাল চরিত্রটি এ ধরনের মানুষের প্রতীক। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেশসেবার নামে এ ধরনের লোকদের ভণ্ডামি, বাকসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

সত্যিকার দেশব্রতী মানুষ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু নন্দলাল এই কঠিন পণ করেছিল যে, দেশের কাজ করার জন্য যে-কোনো ভাবেই তাকে নিজের জীবন রক্ষা করতে হবে। তাই তার আপন ভাই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হলেও সে নিজের মৃত্যুর ভয়ে ভাইয়ের সেবায় এগোয় না, পাছে তার জীবন বিপন্ন হয়, তা হলে দেশের সেবায় বাধা পড়বে। আদতে দেশের জন্য কোনো কিছু না করলেও লোকদেখানো প্রচারের জন্য সে পত্রিকা বের করে। ফলে সারা দিন খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটালেও লোকের ধারণা হয়—নন্দলাল দেশের জন্য খেটে খেটে মরতে বসেছে।

এই রকমই ছিল নন্দলালের দেশপ্রেম। দেশের সেবার নামে নিজের প্রাণ রক্ষাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। তাই যে-কোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই ভয়ে সে গাড়ি চড়ত না, নৌকা-স্টিমারে উঠত না, ট্রেনে চেপে কোথাও যেত না। এমনিভাবে সাপে কাটবে, কুকুরে কামড়াবে কিংবা গাড়িচাপা পড়বে—এই ভয়ে সে পথে বের হওয়াও বন্ধ করে দিল।

এভাবে নন্দলাল আমৃত্যু কেবল বিছানায় শুয়ে বসে বহু কষ্টে দিন কাটিয়ে তথাকথিত দেশসেবা করতে লাগল।

কবি-পরিচিতি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সফল নাট্যকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেও কবি ও গীতিকার হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

তাঁর জন্ম পশ্চিমবাংলার নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করেন। প্রথমে শিক্ষকতা করেন। পরে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে সেটলমেন্ট অফিসার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও আবগারি বিভাগের প্রথম পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন।

'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নূরজাহান' তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক। এ ছাড়া বেশ কিছু নাটক ও প্রহসন তিনি লিখেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গান যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নন্দলাল কবিতাটি কোন ধরনের কবিতা?
   ক. হাসির খ. ব্যাঙ্গাত্মক
   গ. দেশপ্রেমের ঘ. প্রকৃতির

২. নন্দলাল কবিতার রচয়িতা কে?
   ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   গ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঘ. সতেন্দ্রনাথ দত্ত

৩. নন্দলাল শ্রেণীর লোকেরা মূলত কোন প্রকৃতির নয়?
   i. স্বার্থপর ii. ভণ্ড
   iii. দেশব্রতী

নীচের কোনটি সঠিক ?
   ক. i খ. ii
   গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৪. 'নন্দ বাড়ির হত না বাহির'—এর পরের অংশ।
   ক. কোথা কী ঘটে কী জানি, খ. কখন উল্টায় গাড়িখানি
   গ. রেলে কলিশন হয় ঘ. গাড়ি–চাপা পড়া ভয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

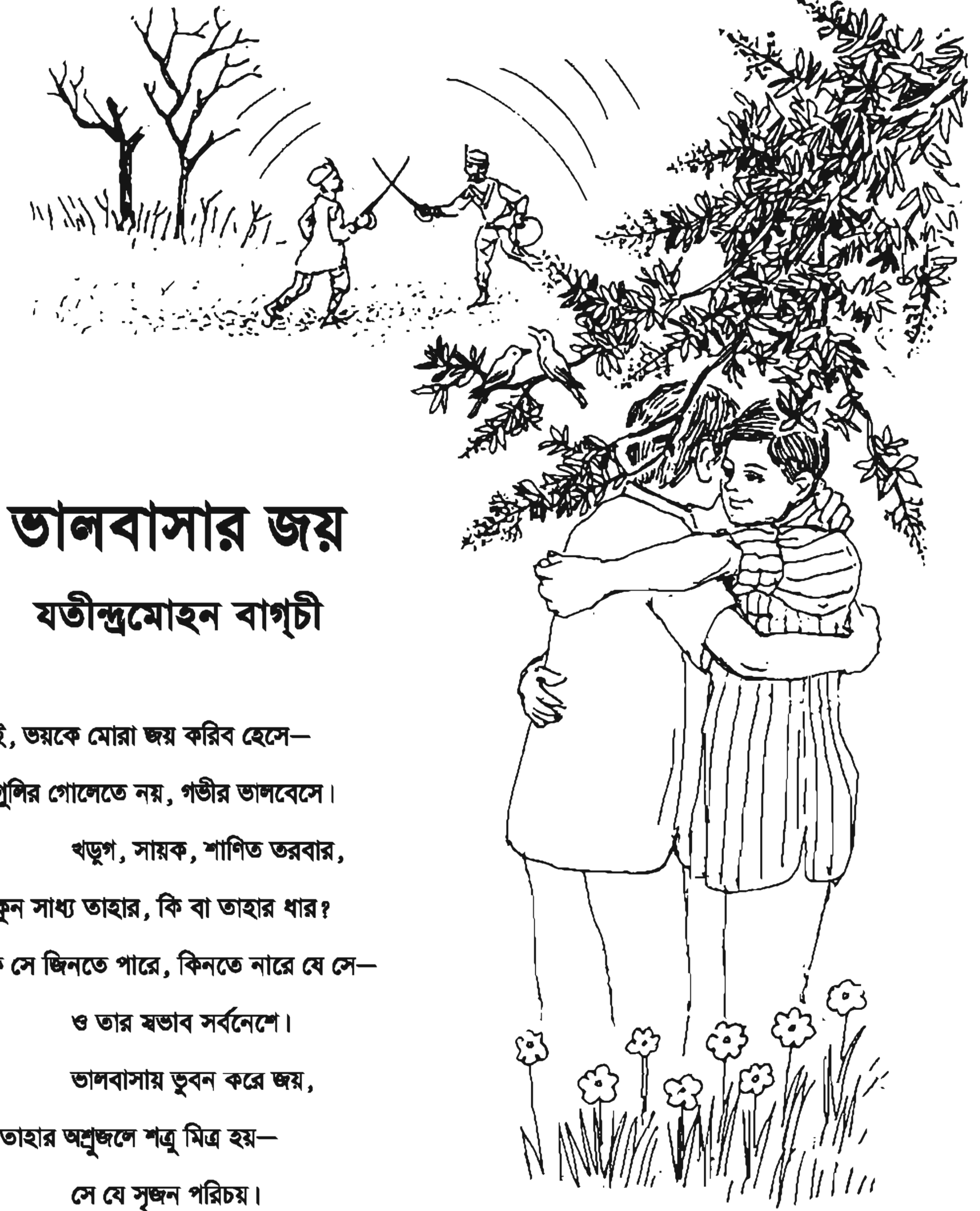
'নন্দলাল' কবিতায় নন্দলাল ভণ্ড, বাকসর্বস্ব, স্বার্থপর ধরনের মানুষের প্রতীক। তার পণ দেশের কাজ করার জন্য যে–কোন ভাবেই হোক সে নিজের জীবনকে রক্ষা করবে। তাই তার নিজের ভাই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হলেও নিজের মৃত্যুর ভয়ে ভাইয়ের সেবায় এগোয় না। আদতে দেশের জন্য কোনো কিছু না করলেও লোকদেখানো প্রচারের জন্য সে পত্রিকা বের করে। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে সে পথে বের হয় না। তার একমাত্র লক্ষ্য নিজেকে টিকিয়ে রাখা। এই রকমই ছিল নন্দলালের দেশপ্রেম।

   ক. নন্দলাল চরিত্রটি কিসের প্রতীক?
   খ. উদ্দীপকের আলোকে নন্দলালের দেশপ্রেমবোধের বর্ণনা দাও?
   গ. একজন দেশপ্রেমিকের কোন ধরনের গুণাবলি থাকা উচিত বলে তুমি মনে কর।
   ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নন্দলাল চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২. **নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

'নন্দলাল' কবিতায় মানুষের আচরণের তির্যক সমালোচনা করা হয়েছে। দেশপ্রেমের নামে বুলিসর্বস্ব মানুষের ভণ্ডামির স্বরূপ ব্যঙ্গ–বিদ্রুপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এক ধরনের লোক আছে যারা মুখে দেশদরদি বড় বড় বুলি কপচায়। কিন্তু বাস্তবে দেশ, জাতির জন্য সামান্যতম ত্যাগও স্বীকার করে না। তারা দেশের শত্রু।

   ক. দেশের শত্রু কারা?
   খ. 'নন্দলাল' কী ধরনের কবিতা?
   গ. নন্দলালের মতো ভণ্ড মানুষের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ বলে তুমি মনে কর–যৌক্তিক উপস্থাপন কর।
   ঘ. কবি নন্দলালের মাধ্যমে সমাজের ভণ্ড মানুষের যে সমালোচনা করেছেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।



ভালবাসার জয়

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

ও ভাই, ভয়কে মোরা জয় করিব হেসে—
গোলাগুলির গোলেতে নয়, গভীর ভালবেসে।
খড়্গ, সায়ক, শাণিত তরবার,
কতটুকুন সাধ্য তাহার, কি বা তাহার ধার?
শত্রুকে সে জিনতে পারে, কিনতে নারে যে সে—
ও তার স্বভাব সর্বনেশে।
ভালবাসায় ভুবন করে জয়,
সখ্যে তাহার অশ্রুজলে শত্রু মিত্র হয়—
সে যে সৃজন পরিচয়।
শত আঘাত—ব্যথা—অপমানে লয় সে কোলে এসে,
মৃত্যুরে সে বন্ধু বলে জাপটে ধরে শেষে।

শব্দার্থ ও টীকা

গোলেতে— ফ্যাসাদে, গোলমালে, ঝামেলায়, গণ্ডগোলে।
খড়্গ— খাঁড়া, এক ধরনের তলোয়ার।
সায়ক— বাণ, খড়্গ।
শাণিত— ধারালো, তীক্ষ্ণ।
তরবার— অসি, তলোয়ার, কৃপাণ।
জিনতে— জয় করতে।
সখ্যে— বন্ধুত্বে।
সৃজন— সৃষ্টি, নির্মাণ, রচনা।
লয়— নেয়, গ্রহণ করে।

পাঠ-পরিচিতি

শক্তির দাপটে নয়, প্রীতির মহিমাই মানুষের জীবনে বরণীয়।

ভয়ের শক্তিকে জয় করার পন্থা অস্ত্রের দাপট নয়, প্রীতির স্নিগ্ধতা। অস্ত্র-গোলাগুলি যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তার ক্ষমতা নেই শত্রুকে জয় করবার। বরং অস্ত্রের ভয়ংকর স্বভাব ক্ষতি ও বিনষ্টি সাধন করবে। পক্ষান্তরে, শত্রুর মন জয় করে তাদের মিত্রে পরিণত করতে পারে ভালোবাসা। ভালোবাসার শক্তি অপরিসীম। সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অপমান, সমস্ত আঘাত বুকে টেনে নিয়ে ভালোবাসার শক্তি মৃত্যুকেও জয় করতে পারে।

কবি-পরিচিতি

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার জামশেদপুরে ২৭শে নভেম্বর, ১৮৭৮ সালে। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী কবিদের এক জন। গ্রামবাংলার শোভন রূপ, গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ ও অবহেলিত নারীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। তিনি 'মানসী' ও 'পূর্বাচল' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'জাগরণী' ইত্যাদি।

১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর কাব্যগ্রন্থ?

ক. লেখা খ. চিত্রা
গ. সোনার তরী ঘ. চক্রবাক

২. 'তরবার' শব্দের অর্থ।

ক. অসি খ. হাতিয়ার
গ. ঢাল ঘ. বান

৩. ‘শত্রুকে সে জিনতে পারে, কিনতে নারে যে সে’—পঙ্‌ক্তিটিতে ‘জিনতে’ শব্দের অর্থ হল

ক. চিনতে
খ. জয় করতে
গ. কিনতে
ঘ. ভুলতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ভালবাসায় ভুবন করে জয়,
সখ্যে তাহার অশ্রুজলে শত্রু মিত্র হয়—
সে যে সৃজন পরিচয়।

ক. উদ্দীপকটির রচয়িতা কে?
খ. শত্রুকে কীভাবে মিত্র করা যায় ব্যাখ্যা কর।
গ. তোমার বিরুদ্ধাচারী কোনো বন্ধুকে কীভাবে তোমার পক্ষে আনতে পার–বর্ণনা কর।
ঘ. ‘ভালোবাসায় ভুবন করে জয়’—পঙ্‌ক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ও ভাই, ভয়কে মোরা জয় করিব হেসে
গোলাগুলির গোলেতে নয়, গভীর ভালবেসে।

ক. উদ্দীপকটি কোন কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে?
খ. ভালোবাসার দ্বারা কী করা যায় লেখ।
গ. উদ্ধৃতাংশে বিপদ কাটিয়ে ওঠার যে পথ নির্দেশ করা হয়েছে তা কতটুকু ফলদায়ক বলে তুমি মনে কর।
ঘ. ‘ভালোবাসার জয়’ কবিতায় যে শক্তির জয় গান করা হয়েছে, উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।